প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৫৫

প্রথম বোধোদয়
গ্রন্থমালা সংস্করণ
২৭শে কার্তিক, ১৩৮৫
(১৪ই নভেম্বর, ১৯৭৮)

প্রকাশক
শ্রীমতী স্বপ্না দেব
পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি
৬০ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীকানাইলাল বসাক
ইণ্ডিয়ান গ্যাশনাল আর্ট প্রেস
১৭৩, রমেশ দত্ত স্ট্রীট
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ
শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী

মূল্য—দুই টাকা
গ্রাহক-মূল্য—১ টাকা ৫০ পয়সা

ডারউইন
অশোক ঘোষ

এক

একজন ছেলে।

ইস্কুলে তার একটুও মন বসতো না। ফাঁক পেলেই, খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে পড়তো।

খাঁচা মানে সেই বোর্ডিং ইস্কুল যেখানে তার বাবা তাকে লেখাপড়া শিখতে পাঠিয়েছিলেন। বোর্ডিং ইস্কুলে মাঝে মাঝে ফাঁক মিলতো বাইরে বেরোবার। ফাঁক পেলেই, ছেলেটি বাড়িমুখো রওনা দিতো—ইস্কুল থেকে তার বাড়ি মাইলটাক রাস্তা।

এতো বাড়ি-বাড়ি মন কেন চার্লসের ?

বাড়ির দিকে নয়, চার্লসের মন পড়ে থাকতো বাড়ি যাবার রাস্তায়।

ইস্কুলের পড়ায় মন বসতো না কেন ?

সে-ইস্কুলে যে-ভাষা শেখানো হতো সে মরা ভাষা, সে-ভাষায় আজ আর কেউ কথা বলে না। যে-সব দেশের ইতিহাস-ভূগোল পড়ানো হতো, সে-সব দেশ আজকের পৃথিবীর ম্যাপে নেই। আর ছিলো কবিতা-লেখা শেখার ক্লাস, কিন্তু তাতে রসকস ছিলো না। বাটলার সাহেবের ইস্কুলে আনন্দ ছিলো না, ছিলো শুধু বেতের শাসানি।

চার্লস নেহাত বোকা ছেলে নয়—অনেক কিছুই সে বুঝতো। ফাঁকিবাজও নয়—ক্লাস কামাই করতো না মোটে।

কিন্তু মন তার পথের উপরেই পড়ে থাকতো।

সবুজ ঘাসে ঢাকা মখমলের মতো মাঠ। সেখানে ভেড়া চরে, গোরু চরে, শুয়োর চরে। নানান জাতের পশু—রঙের রকমারি, গায়ের লোমের রকমারি। ইস্কুলের ছেলেরা এ-সব হয়তো অতো খুঁটিয়ে দেখে না। কিন্তু চার্লস দেখতো। আর খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে যা দেখতো সব মনে করে রাখতে চেষ্টা করতো।

সেই মাঠের শেষে নদী। নদীর ধারে বন। বনে নানান জাতের গাছ। হরেক রকম ফুল। কতো রকমের ফল। চার্লস এ-সব দেখে-দেখে বেড়ায়। চার্লস দেখে—একই জাতের গাছ, কিন্তু যেন ঠিক হুবহু এক নয়—কোথাও ফুলগুলো একটু অন্য ধাঁচের, ফলগুলো একটু অন্য গড়নের। একই জাতের গাছ—কিন্তু যেগুলো বনেজঙ্গলে অযত্নে বেড়ে উঠেছে সেগুলোর ফলের স্বাদগন্ধ একরকম, আর যেগুলো বাগানে মানুষের যত্নে বড়ো হয়েছে সেগুলোর ফল কী মিষ্টি, কী সুন্দর তাদের গন্ধ।

বনে কতো পাখি। কতো জাতের পাখি। রঙ-বেরঙের প্রজাপতি। বিচিত্র আকারের বিচিত্র স্বভাবের কীটপতঙ্গ।

এ-সব সকলেই দেখে। কিন্তু উপর-উপর দেখে। মুগ্ধ হয়ে দেখে।

চার্লসও মুগ্ধ হয়ে দেখতো। কিন্তু খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতো। শুধু দেখবার জন্যেই দেখতো না, শেখবার জন্যেও দেখতো। খুঁটিনাটি তফাত-গুলো মনে করে রাখতো। নোতুন কিছু পোকামাকড়। কড়ি-ঝিনুক, রকমারি পাথর, খনিজ, ধাতু, সিলমোহর, মুদ্রা।

আর লিখতো। সব কথা তো মনে করে রাখা যায় না। তাই খাতার পর খাতা ভরে সব টুকে রাখতো।

ইস্কুলের বইয়ে চার্লসের মন বসতো না। কিন্তু তবু মন বসাতে হতো। ইস্কুলের বই শেষ করে চার্লস অন্য বই খুলে বসতো। মন ডুবে যেতো সে-সব বইয়ে।

অন্য কী বই ?

জীবজন্তুর বই. গাছপালার বই, দেশভ্রমণের বই। চার্লসের একটা মনের মতো বই ছিলো : অবাক পৃথিবী ('ওঅন্ডারস অব দি ওঅরলড')। প্রায়ই সে ঐ বইখানা খুলে বসতো। বন্ধুদের কাছে ঐ বইয়ের গল্প বলতো। ঐ বই পড়তে-পড়তে চার্লসের ভারি ইচ্ছে হতো, জাহাজে চেপে অনেক—অনেক দূরের দেশে চলে যাই।

সে সাধ তার একদিন পূর্ণ হয়েছিলো।

এই-সব বই ছাড়া চার্লস ভালোবাসতো ইউক্লিডের জ্যামিতি পড়তে। আর তার ভালো লাগতো শেকশপীয়রের ঐতিহাসিক নাটকগুলো পড়তে। বোর্ডিং বাড়ির বড়ো জানলার পাশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে-বসে শেকসপীয়র পড়তে, স্কট আর বায়রনের কবিতা পড়তে চার্লসের একটুও ক্লান্তি লাগতো না।

ভালো লাগতো মাছ ধরতে। নদীতে বা পুকুরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছিপ ফেলে সে বসে থাকতো।

শিকারের কথা উঠলে চার্লসকে আর পায় কে ?

শিকারের নেশায় যখন তাকে পেয়ে বসতো তখন রাতে শুতে যাবার

সময় জুতো-টুপি খুলে শিয়রের কাছে রেখে দিতো—সকালে ঘুম ভাঙতেই যেন বন্দুক কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারে।

আর-একটা শখ ছিলো : একা-একা পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ায় চেপে মাইলের পর মাইল বেড়িয়ে বেড়ানো। ইংল্যান্ডে ওয়েলস বলে যে-জায়গা সেখানে প্রকৃতি বড়ো সুন্দর। চার্ল্স একবার ঘোড়ায় চেপে ওয়েলস-এর সীমানা ধরে ঘুরে এলো। সেই ভ্রমণের স্মৃতি চার্ল্স জীবনে কোনো দিনও ভোলে নি।

একটা মজার গল্প বলি।

একবার চার্ল্সের ইস্কুলে যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠলো। তাকে দেখলেই ক্লাসের ছেলেরা চিৎকার করে উঠতো : "ঐ-যে গ্যাস, ঐ-যে গ্যাস"! চার্ল্স অস্থির হয়ে উঠতো।

কেন ? একটা ইতিহাস আছে।

চার্ল্সের এক দাদা কলেজ পড়তেন। তাঁর একবার কী খেয়াল হলো, বাড়ির বাগানে যন্ত্রপাতি রাখবার ঘরে তিনি এক ল্যাবরেটরি বানিয়ে ফেললেন—চমৎকার সাজানো-গোছানো এক রসায়নের ল্যাবরেটরি। সেখানে তিনি নানা রকম রাসায়নিক পরীক্ষা করতেন—গ্যাস বানাতেন, এটা-ওটা মিশিয়ে রাসায়নিক যৌগ পদার্থ তৈরি করতেন।

চার্ল্সের বরাত—দাদা তাকে তাঁর কাজে সাহায্য করতে ডাকলেন। সাহায্য মানে অবশ্য ছুটকো ফাইফরমাস খাটা—এটা তোল্, ওটা পাড়্, সেটা আন্। চার্ল্স তাতেই বর্তে গেলো—দাদা তাকে নিজের হাতে কাজ করতে যদি নাও দেন, নিজের চোখে সে সব কাণ্ডকারখানা দেখতে তো পাবে! দাদা অবশ্য ভাইয়ের উৎসাহ আর আগ্রহ দেখে শেষ পর্যন্ত তাকে নিজের

হাতে কাজ করতে দিতেন। এমন অনেক দিন হয়েছে : বাড়ির আর সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে- দুই ভাইয়ে নিশুত রাত পর্যন্ত জেগে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করছে, গ্যাস বানাচ্ছে।

ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলো। তাইতেই ইস্কুলের ছেলেদের ঐ টিটকিরি-র "ঐ-যে গ্যাস, ঐ-যে গ্যাস"!

কথাটা হেডমাস্টার মশাইয়ের কানে উঠলো। তিনি এ-সব পছন্দ করলেন না—ক্লাসভরতি ছেলেদের সামনেই চার্লসকে খুব একচোট বকুনি দিলেন : বেয়াড়া ছেলে, লেখাপড়া ছেড়ে বাজে কাজে সময় নষ্ট করে!

ছেলের মতিগতি দেখেশুনে বাবাও কী বুঝলেন কে জানে—চার্লসকে তিনি ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এডিনবরো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি করে দিলেন—ডাক্তারি পড়বার জন্যে।

দুই

দার্শনিক ইরাজমাস ডারউইনের নাতি, নামজাদা ডাক্তার রবার্ট ডারউইনের ছেলে, চার্লস ডারউইন ১৮২৪ সালে এডিনবরো শহরে চললেন—ডাক্তার হবার জন্যে।

চোখ বুজে মনে-মনে যদি সওয়া-শ দেড়-শ বছর আগেকার সেই ইংল্যান্ডে—চার্লস ডারউইনের কৈশোর-যৌবনের ইংল্যান্ডে গিয়ে পৌঁছই, দেখবো দেশটা উত্তেজনায় দবদব করছে।

জানতে হবে। জল-স্থল-আকাশের সবকিছুকে জানতে হবে। ঘর ছেড়ে, সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে, নদীপ্রান্তরমরুভূমি পার হয়ে সবকিছুকে তলিয়ে খুঁটিয়ে জানতে হবে—মানুষের জানার সীমার বাইরে কিছুই থাকতে পারে না।

ইংল্যান্ডের এ নেশা কেন ?

কেননা, সেদিনকার ইংল্যান্ড পৃথিবী জয় করতে চেয়েছিলো। সেদিন গ্রাম-ইংল্যান্ড শহর-ইংল্যান্ড হয়ে উঠেছে। শহরে শহরে আকাশের গায়ে মাথা তুলে উঠছে বড়ো বড়ো কারখানার চিমনি,—কাপড়ের কারখানা, পশমের কারখানা, লোহার ইস্পাতের কারখানা, মাংসের কারখানা, রেল-এঞ্জিন তৈরির কারখানা, জাহাজ তৈরির কারখানা।

মেশিনের চাকা অবিশ্রাম ঘুরছে আর অবিশ্রাম আওয়াজ তুলছে : চাই আরো চাই, আরো খোরাক চাই, আরো তুলো চাই পশম চাই, পাহাড়-প্রমাণ কাপড়ের থান বানিয়ে দিতে চাই, লোহা আর ইস্পাত চাই, আরো রেল আরো জাহাজ বানিয়ে দিতে চাই।

অফুরন্ত চাহিদা যন্ত্রের।

তাই ইংল্যান্ডকে চষে বেড়াতে হলো নিজের দেশ—নিজের দেশের বনজঙ্গল, প্রান্তরপর্বত, নদীসমুদ্র। নামতে হলো খনির অতল অন্ধকারে। পাল মেলতে হলো অকূল সমুদ্রের বুকে। দেখো, দেখো, আরো নজর করে দেখো, কোথায় কী আছে যন্ত্রের রসদ খুঁজে নিয়ে এসো।

সেদিনকার ইংল্যান্ডকে জানবার নেশায় পেয়ে বসেছিলো : জানতে হবে, জেনে হাতে পেতে হবে, ব্যবহার করতে হবে। আরো পশম চাই। চাষের জমি ঘিরে ফেলে পাল-পাল ভেড়া চরাও। পরখ করে দেখো কোন্ কোন্ জাতের ভেড়ার গায়ে বেশি পশম, ভালো পশম জন্মায়। সেই জাতের ভেড়াকে বাছাই করে নিয়ে তার বংশ যাতে আরো বাড়ে তার ব্যবস্থা করো।

গোটা দেশটা মন্ত্র নিয়েছে—দেখো, জানো, দেখে-জেনে কাজে লাগাও।

শহরের এই দবদবানি তখনো গ্রামে এসে পৌঁছয়নি। সেখানে তখনো জীবন চলে পুরোনো চালে। কিন্তু গ্রামের ছেলে চার্লস গ্রামে থাকতেই তার স্বভাবের টানে এই দেখবার আর জানবার ঝোঁকে চলছিলো। মাস্টারমশাইয়ের ধমক, ইস্কুলের ছেলেদের টিটকিরি, বাবার বেজার মুখ—কিছুই তার স্বভাবের টানকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি।

তিন

বিশ্ববিদ্যালয়-শহর এডিনবরোয় এসে সে-ছেলের ডাক্তার হওয়া মাথায় উঠলো।

তখনকার দিনের ডাক্তারি-শাস্ত্র আজকের চেয়ে অনেক অনেক পিছিয়ে ছিলো। হাতেকলমে পরখ করে শেখার বালাই ছিলো না, বসে-বসে শুধু অধ্যাপকের একঘেয়ে নীরস বক্তৃতা শুনে যাও। হাতেকলমে শিক্ষা বলতে যেটুকু তার মধ্যে ছিলো সামনে দাঁড়িয়ে অপারেশন দেখা। ডারউইন দুবার অপারেশন-ঘরে ঢোকেন। তখনও ক্লোরোফর্মের আবিষ্কার হয় নি। অপারেশনের সময়ে রোগীরা অসহ্য যন্ত্রণায় বুকফাটা চিৎকার করতো। একবার একটা ছোটো ছেলের অপারেশনের সময়ে ডারউইন উপস্থিত ছিলেন। ছেলেটির মর্মান্তিক চিৎকার শুনে ডারউইন স্থির থাকতে পারেন নি—তক্ষুনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। তৃতীয় বার আর তিনি ও-পথ মাড়ান নি।

ডাক্তারির পড়ায় মন না বসলেও বাবার মন রাখার জন্যে ডারউইন ক্লাসে নিয়মিত হাজিরা দিতেন। কিন্তু তাঁর আসল ক্লাস—সত্যিকারের পড়া—ছিলো কলেজপাড়া থেকে অনেক দূরের দূরের পাড়ায়, সমুদ্রের ধারে, জেলেদের বস্তিতে। জেলেরা যখন শামুক-ঝিনুক ধরবার জন্যে সমুদ্রে

নেমে পড়তো, ডারউইন তাদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তাদের ট্রলারে চেপে বসতেন, জালে-ধরা-পড়া নানান সামুদ্রিক জীবের নমুনা সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরতেন। বাড়ি ফিরে সেগুলোকে কেটেকুটে মাইক্রোসকোপের নিচে রেখে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতেন।

এডিনবরোয় ডারউইনের কয়েকজন মনের মতো বন্ধু জুটে গিয়েছিলো। তাঁরাও তাঁরই মতো প্রকৃতিসন্ধানী। কয়েকজনের নাম : এইনসওঅর্থ—তাঁর অনুরাগ ছিলো ভূতত্ত্বে, কোলডস্ট্রীম—তাঁর প্রাণিতত্ত্বে শখ। হ্যার্ডি—তাঁর অনুরাগ উদ্ভিদবিদ্যায়। আর প্রাণিতত্ত্ববিদ গ্রান্ট। তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় ডারউইনের বহু সময় কাটতো। অনেক নতুন কথা শুনতেন, তাই নিয়ে ভাবতেন, প্রবন্ধ লিখতেন।

গ্রান্ট আর কোলডস্ট্রীমের সমুদ্রের প্রাণীদের সম্পর্কে ঝোঁকটা ছিলো বেশি। তাঁরা মাঝে-মাঝেই সমুদ্রতীরে যেতেন নমুনা সংগ্রহ করার জন্যে। ডারউইন তাঁদের সঙ্গ ছাড়তেন না।

তখন এডিনবরোয় একটা সমিতি ছিলো : প্লিনিয়ান সোসাইটি। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাটির নিচের একটা ঘরে সোসাইটির বৈঠক বসতো। ছাত্রেরা অধ্যাপকেরা সেখানে প্রকৃতিবিজ্ঞানের নানান বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ পড়তেন, আলোচনা করতেন। ডারউইন সেই সমিতির সদস্য হয়েছিলেন, নিয়মিত বৈঠকে যোগ দিতেন। দু-একটা প্রবন্ধও পড়েছিলেন।

ডাক্তার রবার্ট ডারউইন হতাশ হয়ে পড়লেন। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন, ছেলের বুঝি বৈজ্ঞানিকের মেজাজ। তাই তিনি ডাক্তারি পড়তে পাঠিয়েছিলেন। ডাক্তারিও তো বিজ্ঞান।

কিন্তু দেখে আর ঠেকে বুঝলেন, বিজ্ঞান শেখা ও-ছেলের ধাতে

নেই। সুতরাং ও কেমব্রিজে গিয়ে পাদরি হবার কলেজে ভরতি হোক।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, ডারউইন কেন তখন বিশেষ আপত্তি করেন নি। কেন করেন নি, বুড়ো বয়সে তাই ভেবে তাঁরও ভারি মজা লাগতো। কেননা, একদিন ইংল্যান্ডের গোটা পাদরিসম্প্রদায় এই ডারউইনের ওপরই খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিলো। সে ইতিহাস পরে।

১৮২৮ সালে ডারউইন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি হলেন।

এডিনবরোয় দু বছর যেমনভাবে কেটেছিলো, কেমব্রিজের তিন বছরও মোটামুটি সেইভাবেই কাটলো, সেই কলেজের ছকবাঁধা একঘেয়ে বক্তৃতায় মন না বসা, হেঁটে বা ঘোড়ায় চেপে দেশ বেড়াবার বা শিকারের কথা উঠলেই মন চনমনিয়ে ওঠা, বৈজ্ঞানিক-মহলে আনাগোনা, আলাপ জমানো, বক্তৃতা শোনা, বিজ্ঞানের নোতুন নোতুন বই পড়া, প্রবন্ধ লেখা, বনেজঙ্গলে পোকামাকড় সংগ্রহ করে বেড়ানো।

পোকা ধরার একটা গল্প মনে পড়ছে।

একদিন ডারউইন বনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, চোখে পড়লো অদ্ভুত ধরনের পোকা—একটা নয়, একেবারে একজোড়া। দুহাত দিয়ে দুটোকেই বাগিয়েছেন, এমন সময় উড়ে এলো আর-একটা। ওটাকেও ছাড়া হবে না। কিন্তু কী করে? দু হাতই যে জোড়া! ডান হাতেরটা মুখে পুরে দিয়ে ডারউইন তিন নম্বরটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু তিন নম্বরটা সহজে ধরা দেবে না—চালাকি খেলতে লাগলো। আর এদিকে দু নম্বরটা তাঁর মুখের মধ্যে বিষ ঢালতে লাগলো। জিভ পুড়ে যেতে লাগলো,

যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তিনি মুখ থেকে সেটাকে ফেলে দিলেন। আর এই সুযোগে তিন নম্বরটাও উধাও।

এই সংগ্রহ-বাতিকের সঙ্গে যোগ হলো আরো দুটি নোতুন শখ : ছবির গ্যালারিতে গিয়ে ছবি দেখা, এক-আধটা ছবি কেনা, ছবির সম্পর্কে লেখা বই পড়া, আর গানের জলসায় গান শোনা।

এখানে হেন্‌স্‌লোর কথা বলতে হয়। নইলে ডারউইনের কেমব্রিজ-জীবনের কথা প্রায় কিছুই বলা হয় না।

হেন্‌স্‌লো ছিলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক। উদ্ভিদবিদ্যা তাঁর বিশেষ বিষয় হলেও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি বিষয়েই তাঁর ভালো দখল ছিলো। সপ্তাহে একদিন তাঁর বাড়ির দ্বার অবারিত। বিজ্ঞানে যারই অনুরাগ তারই সেদিন সেখানে সাদর নিমন্ত্রণ। সভা বসতো, বিজ্ঞানের নানান বিষয়ে আলোচনা হতো, প্রবন্ধ পড়া হতো। ডারউইনেরও ডাক পড়লো সেই-সব বৈঠকে যোগ দেবার। ক্রমে যাতায়াত বাড়তে বাড়তে ডারউইন অধ্যাপকের খুব প্রিয় হয়ে উঠলেন। বেড়াতে বেরোবার সময় তিনি ডারউইনকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। পথে যেতে যেতে বিজ্ঞানের নানান বিষয়ে গুরুশিষ্যে আলোচনা হতো। বাড়ি ফিরতে ফিরতে অনেক দিন সন্ধ্যা হয়ে যেতো। হেন্‌স্‌লো তখন ছাত্রকে টেনে তাঁর খাবার টেবিলে নিয়ে যেতেন, না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়তেন না।

কেমব্রিজের বছরগুলো এইভাবেই কাটতে লাগলো। শেষের বছরে অধ্যাপক হেন্‌স্‌লোর উপদেশে ডারউইন ভূতত্ত্ব বা জিওলজি সম্পর্কে বিশেষ করে পড়াশোনা আর পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। হাতেকলমে ভূতত্ত্ব শেখার একটা সুযোগও হাতেহাতে মিলে গেলো। অধ্যাপক সেজ্‌উইক

ছিলেন তখনকার একজন নামকরা ভূতত্ত্ববিদ। তিনি উত্তর ওয়েলসের পাহাড়ী অঞ্চলে ভূতাত্ত্বিক সফরে বেরোবেন বলে ভাবছিলেন। অধ্যাপক হেন্‌স্‌লোর অনুরোধে অধ্যাপক সেজ্‌উইক ডারউইনকে তাঁর সফরের সঙ্গী করতে রাজি হলেন। কী করে একটা দেশকে চিনতে হয়, তার নানান ধরনের মাটিকে, নানান স্তরের মাটিকে বুঝতে হয়, কোন স্তরের বয়স কতো কী ভাবে তা হিসেব করতে হয়, এ-সব জিনিস ডারউইন নিজের চোখে দেখে নিজের হাতে পরখ করে শিখে নিলেন।

এই ছিলো ডারউইনের আসল জীবন। কিন্তু তাই বলে কলেজের পড়ায় তিনি ফাঁকি দিতেন না, এবং শেষ পর্যন্ত তিনি পরীক্ষায় পাসও করেছিলেন।

চার

১৮৩১ সাল। উত্তর ওয়েলস সফর করে ডারউইন সবে বাড়ি ফিরে ক্লান্ত দেহটাকে একটু বিশ্রাম দিচ্ছেন। এমন সময় একটা চিঠি : 'ডারউইন, পৃথিবী বেড়াতে যাবে ?'

'এক্ষুনি !' পৃথিবী ঘুরে বেড়ানো কতো দিনের সাধ। সে সাধ কি পূর্ণ হবে ?

হ্যাঁ, হবে। অধ্যাপক হেন্‌স্‌লো চিঠিতে লিখেছেন, বীগল বলে একটা জাহাজ পৃথিবীভ্রমণে বেরোবে। সেই জাহাজের ক্যাপটেন ফিত্‌জ-রয় তাঁর কামরায় একজন তরুণ বিজ্ঞানীকে জায়গা দিতে রাজি আছেন। তবে মাইনে-টাইনে কিছু নেই, সব খরচ নিজের। এই শর্তে রাজি থাকলে যেতে পারো।

যাবে কি ! পাদরি হতে হবে না ?

চুলোয় যাক ! তক্ষুনি জবাব লিখে দিতে চাইলেন ডারউইন : রাজি, আমি যাবো। কিন্তু

লেখা হলো না। কে বাদ সাধলেন ?

বাবা, ডাক্তার রবার্ট ডারউইন। তিনি অনেক সহ্য করেছেন, খামখেয়ালিপনা করে জীবনটাকে নষ্ট করা আর তিনি বরদাস্ত করবেন না—স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন। তবে—

কী ? তবে কী ?

তবে—বিচক্ষণ কোনো মানুষ যদি বলেন, যাওয়া উচিত, সংগত কাজ, তাহলে তিনি অমত করবেন না।

খাতার পাতে আনমনে আঁকিবুকি কাটতে-কাটতে তুমি হয়তো হঠাৎ অবাক হয়ে দেখলে, একটা আশ্চর্য চেহারা ফুটিফুটি করছে। আর এক-আধটা আঁচড় বুঝেশুনে দিতে পারলেই মূর্তিটা যেন প্রাণ পেয়ে কথা কয়ে উঠবে। ঠিক এমনি সময়ে

ব্যস্ত হাতের ধাক্কা লেগে কালির দোয়াতটা উপুড় হয়ে পড়ে যায় যদি খাতার উপর ?

ডারউইন মুষড়ে পড়লেন। অধ্যাপক হেন্‌স্‌লোকে জানিয়ে দিলেন, হলো না, বাবার মত নেই।

কিন্তু—হলো। বাবার মত হলো। একজন বিচক্ষণ বললেন, এমন সুযোগ একবার ছাড়লে আর আসে ? এই কথা বললেন ডারউইনের কাকা। খবর তাঁর কানে পৌঁছতেই শুধু এই কথাটি বলার জন্যে তিনি গাড়ি হাঁকিয়ে দাদার বাড়ি এসে হাজির। ভাইয়ের সাংসারিক বিষয়-বুদ্ধির উপর ডাক্তারের খুব বিশ্বাস ছিলো। শেষ পর্যন্ত তিনি মত দিলেন।

আর দেরি করে ? পরদিনই ডারউইন ছুটলেন কেমব্রিজে অধ্যাপকের কাছে। তাঁর চিঠি পকেটে পুরেই লন্ডনে ক্যাপটেন ফিত্‌জ্‌-রয়ের কাছে।

ক্যাপটেনের একটা বাতিক ছিলো : খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে লোকের মুখ দেখা। কেন ? তাঁর ধারণা ছিলো, মুখের আদল দেখে মানুষের স্বভাবের আঁচ পাওয়া যায়। ডারউইনের মুখে কি কোন খুঁত পেলেন ক্যাপটেন ? হ্যাঁ, তাঁর নাকটা ছিলো বোঁচা। ক্যাপটেনের ধারণা, যার নাক টিকলো

নয় সে তেমন খাটিয়ে হয় না। তাই প্রথম-প্রথম ডারউইনকে সঙ্গে নিতে তাঁর মন সরছিলো না। কিন্তু কী ভেবে কে জানে, শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেলেন।

কথাবার্তা পাকা হয়ে গেলো।

শুধু জাহাজের নোঙর খুলতে যা দেরি।

পাঁচ

ইংল্যাণ্ডের প্লাইমাউথ বন্দর থেকে 'বীগল' জাহাজ সমুদ্রে পাড়ি দিলো।

সেদিন ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৩১ সাল।

কেবিনের কোণটুকুতে বসে ডারউইন একমনে পড়ছেন। কী বই? চার্লস লাএল-এর 'ভূতত্ত্বের মূলনীতি'। সদ্য প্রকাশিত হয়েছে।

ভগবান এক-একবার সৃষ্টি করেন পৃথিবী, তারপর তা প্রলয়ে ভাসিয়ে দেন, আবার নোতুন করে সৃষ্টি করেন—বহুদিন পর্যন্ত মানুষের এই ছিলো বিশ্বাস।

লাএল বললেন, ওসব একেবারে অবাস্তব কথা। প্রলয়ের কথা ভিত্তিহীন। তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন কীভাবে এই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে, কী কী নিয়মে তার নানান পরিবর্তন রূপান্তর ঘটেছে। আজও আমাদের চোখের সামনে সেই-সব পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

বইখানা পড়তে পড়তে ডারউইনের চোখ খুলে গেলো, পুরোনো ভুল ধারণাগুলো ভেঙে গেলো।

সমুদ্র, দ্বীপ, উপদ্বীপ, দেশ, মহাদেশ—আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ। 'বীগল' ঢেউ ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে এগোয়—

ডারউইন ডেকে দাঁড়িয়ে চারদিক চেয়ে-চেয়ে দেখেন। জাহাজ এসে কোনো দ্বীপে নোঙর ফেলে—ডারউইন ডাঙায় নেমে পড়েন। নেমে পড়ে দেখতে-দেখতে এগোন। কী দেখেন? গাছপালা, জীবজন্তু, তাদের কঙ্কাল, তাদের পাথরে-ছাপ-পড়ে-যাওয়া মূর্তি, যাকে বলে ফসিল। যাই দেখেন—খুঁটিয়ে দেখেন, তলিয়ে দেখেন। যা দেখেন লিখে রাখেন।

ভারি মজার জিনিস ডারউইনের চোখে পড়ে।

দেখেন, একই জাতের উদ্ভিদ—আফ্রিকার কাছাকাছি দ্বীপগুলোতে দেখতে যেমন, আমেরিকার আশেপাশের দ্বীপগুলোতে ঠিক হুবহু তেমন নয়, একটু অন্য রকম। ডারউইন ভাবেন, এমন তফাত হয় কেন?

এক দেশে দেখেন, একই জন্তু—কিন্তু যেগুলো এখন চলেফিরে বেড়াচ্ছে সেগুলো দেখতে ছোটো, আর তাদের যে পূর্বপুরুষদের কঙ্কাল মাটির নিচে ফসিল হয়ে গেছে সেগুলো অনেক বড়ো। ডারউইন ভাবেন, এমন তফাত হলো কেন?

এক জায়গায় একটা কঙ্কাল তাঁকে বড়ো ভাবিয়ে তুললো। এখনকার দিনের একটা নয়, অনেকগুলো জন্তুর সঙ্গে তার মিল দেখা যায়, অনেকগুলো জন্তুর শরীর যেন সেই একটা শরীরে মিলেমিশে আছে। রেল-রাস্তার যেমন জংশন ইস্টিশান, সেখান দিয়ে এক-এক গাড়ি আলাদা-আলাদা লাইনে বেরিয়ে যায়, এই আগেকার দিনের জন্তুটিও যেন তেমনি জংশনের জন্তু—তার থেকে, বদলে-বদলে, নানান জাতের জন্তু নিজের নিজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে এক-এক পথ ধরে এগিয়ে গেছে।

আর সেই সঙ্গে ডারউইন ভূতত্ত্বের আলোচনা করতে থাকেন। যে দেশেই যে দ্বীপেই যান—সেই দেশের সেই দ্বীপের জমি, পাহাড়, নদী-

উপত্যকার গঠন পরীক্ষা করেন, তার বয়স হিসাব করেন। লাএল-এর বইয়ের শিক্ষাকে তিনি পুরোপুরি কাজে লাগান। তাঁর ইচ্ছে হয়, যে-সব দেশের উপর দিয়ে তিনি ঘুরে বেড়ালেন, সে-সব দেশের ভূতাত্ত্বিক বিবরণ দিয়ে তিনি একখানা বই লিখবেন।

যা দেখেন তাই লিখে রাখেন। ইস্কুল থেকেই তাঁর এই অভ্যাস। ভরে ওঠে পাতার পর পাতা, খাতার পর খাতা।

সেই লেখাই চিঠি করে পাঠান বাড়িতে বাবার কাছে, বোনেদের কাছে, অধ্যাপক হেন্‌স্‌লোর কাছে। বেছে-বেছে ফসিলও পাঠান অধ্যাপকের কাছে। অধ্যাপক আবার অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের ডেকে সে-সব দেখান।

একবার বাড়ির একটা চিঠিতে ডারউইন পড়লেন, অধ্যাপক সেজউইক তাঁর লেখা ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়ে আর তাঁর পাঠানো ফসিল দেখে বলেছেন, চার্লস ভবিষ্যতে একজন উঁচুদরের বৈজ্ঞানিক হবে। অধ্যাপকের এই প্রশংসা পড়ে ডারউইনের কী-যে আনন্দ হলো! আত্মজীবনীতে ডারউইন লিখেছেন, এই চিঠি পাবার পর আমি লাফ মেরে-মেরে পাহাড়ে উঠতে লাগলাম, আমার হাতুড়ির ঘায়ে-ঘায়ে পাহাড় কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগলো! কী উচ্চাভিলাষী ছিলাম আমি!

পাঁচ বছর ধরে 'বীগল' সমুদ্রে-সমুদ্রে ঘুরে বেড়ালো। আর ডারউইনের খাতা ভরে উঠতে লাগলো।

১৮৩৬ সালে ডারউইন পাঁজা-পাঁজা খাতা নিয়ে জাহাজ থেকে নামলেন। সে-সব খাতায় অসংখ্য তথ্য—জীবজগৎ সম্পর্কে এতো তথ্য তখন আর কেউ জানে না।

এতো তথ্য থেকে মানুষের কী উপকার হবে? মানুষের জ্ঞানের সীমা কি কিছু বাড়বে?

নিশ্চয়ই বাড়বে। শুধু রাশি-রাশি তথ্য জোগাড় করবার জন্যে ডারউইন জন্মান নি। একটা নোতুন কথা, প্রকৃতিবিজ্ঞানের একটা নোতুন সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন ডারউইন। সেই কথাটি, বিজ্ঞানের সেই সূত্রটি মানুষের সমস্ত পুরনো আদ্যিকেলে ধারণাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।

ডারউইন ভাবছিলেন। ভাবছিলেন, এতো যে দেখলাম তার মানেটা কী। জাহাজে থাকতে-থাকতেই ভাবতে শুরু করেছিলেন। গভীরভাবে ভাবছিলেন, তাঁর সমস্ত বুদ্ধিকে এক জায়গায় জড়ো করে একাগ্র হয়ে এই অসংখ্য তথ্য আর ঘটনার রহস্য ভেদ করতে চেষ্টা করছিলেন—এতো যে দেখলাম, তার মানেটা কী ?

ভাবতে-ভাবতে একটা কথা তাঁর মনে হচ্ছিল। কিন্তু মনে হলে

তো চলবে না। বিজ্ঞান মনে হওয়ায় বিশ্বাস করে না ; মনে হওয়াকে যুক্তি দিয়ে তথ্য দিয়ে প্রমাণ করতে হবে।

কী কথা ডারউইনের মনে হচ্ছিলো ?

"আমাদের এই গ্রহ যেমন মহাকর্ষের স্থির নিয়ম অনুসারে ক্রমাগত ঘুরে-ঘুরে চলেছে ঠিক তেমনি খুব সামান্য এক আরম্ভ থেকে সবচেয়ে সুন্দর সবচেয়ে আশ্চর্য অসংখ্য রূপ ক্রমাগত বিকশিত হয়েছে, এখনো বিকশিত হচ্ছে।"

ডারউইনের এই কথাটার মানে কী ?

পৃথিবীর সবকিছু বদলে যাচ্ছে। পৃথিবীরই বদল হচ্ছে। পৃথিবীর প্রথম চেহারা বদলে-বদলে আজকের পৃথিবী হয়েছে, আজকের পৃথিবীর উপরও বদলের পালা চলছে।

পৃথিবীর উদ্ভিদজগৎ প্রাণিজগৎও বদলে-বদলে চলেছে। প্রথম প্রাণী ছিলো ছোটো, সামান্য, সরল। তার পর ক্রমাগত পুরোনো বদলে নোতুন দেখা দিচ্ছে, সাধারণ বদলে বিশেষ দেখা দিচ্ছে, সরল বদলে জটিল দেখা দিচ্ছে, জীবজগৎ নিচের ধাপ পেরিয়ে উপরের ধাপে উঠে আসছে। এই ধরনের কথা ডারউইনের মনে হচ্ছিলো।

তাহলে অপেক্ষা কিসের ? তাঁর জানা এতো অসংখ্য তথ্যপ্রমাণের সাহায্যে ডারউইন এই মনে-হওয়াকে বৈজ্ঞানিক সত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন না ? ডারউইন বললেন, অপেক্ষা করতে হবে।

এতো দেখে, এতো জেনেও ডারউইন বললেন, যথেষ্ট হয় নি—আরো দেখতে হবে, আরো জানতে হবে। অকাট্য প্রমাণ দিতে হবে। কোথাও যেন ভুল না থেকে যায়।

সমুদ্রজীবন শেষ করে দেশে ফিরে ডারউইন বাকি জীবনটা তপস্বীর

মতো কাটাতে লাগলেন। জ্ঞানের তপস্যা—পরীক্ষা, অধ্যয়ন, আলোচনা, লেখা। ২৩ বছর ধরে এই একমুখী শ্রমকঠোর জীবনযাপন।

ছয়

ডারউইনকে আরো দেখতে হবে, পরখ করতে হবে। তার জন্যে ল্যাবরেটরি চাই।

কিন্তু শহরে নয়, গ্রামে—প্রকৃতির কাছাকাছি।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর ডারউইন সারে-জেলার ডাউন গ্রামে একখানা মনের মতো বাড়ি পেলেন। শহরের কোলাহল থেকে কিছুটা দূরে নিভৃত একখানি গ্রাম—একমনে বিজ্ঞানসাধনার উপযুক্ত স্থান। ১৮৪২ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর ডারউইন নোতুন বাড়িতে উঠে এলেন।

ডারউইনের স্বাস্থ্য তেমন ভালো ছিলো না, বেশি চলাফেরা করলে অসুস্থ হয়ে পড়তেন। সেজন্যে সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানে বড়ো-একটা যেতেন-আসতেন না। আত্মীয়বন্ধু পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা আলাপ করতে তাঁর ভালোই লাগতো, কিন্তু শরীরে কুলোতো না। মাঝে-মাঝে তাই তিনি আক্ষেপ করতেন। কিন্তু আবার কাজের মধ্যে ডুবে গেলে আক্ষেপ দূর হয়ে মনে পেতেন পরম তৃপ্তি।

খুব ভোরে ওঠার অভ্যাস ছিলো ডারউইনের। মুখ-হাত ধুয়েই বেড়াতে বেরোতেন। ঠিক পৌনে আটটার সময় জলখাবার খেয়েই কাজের ঘরে ঢুকতেন।

ডারউইনের কাজের ঘরের একটা বর্ণনা তাঁর ছেলের স্মৃতিকথায় পাওয়া যায়।

জানলার সঙ্গে আটকানো একটা শক্ত বোর্ড ছিলো তাঁর কাটাকুটি-পরীক্ষা করার টেবিল। যাতে বসে-বসে কাজ করতে সুবিধে হয় সেইজন্যে টেবিলটা নিচু করে বসানো। পাশেই আরেকটা গোল টেবিল, তার এক-একটা ড্রয়ারে একেক রকম জিনিস থাকতো। ড্রয়ারে লেবেল মারা থাকতো : 'সেরা যন্ত্রপাতি', 'কাজ-চলা যন্ত্রপাতি', 'নমুনা'। কাজ করতে-করতে যখন যেটা দরকার হতো ড্রয়ার টেনে বার করে নিতেন। টেবিলের ডান দিকে সার-সার তাক। তার উপর টুকিটাকি জিনিস সাজানো—কাচের গেলাস, ডিশ, বিস্কুটের টিন (চারা গজানোর জন্যে), দস্তার লেবেল, বালিভরতি কাচের গামলা—এইসব রকমারি জিনিস।

এইরকম পরিপাটি গোছালো স্বভাবের মানুষ ছিলেন বলেই ডারউইনের অযথা সময় নষ্ট হতো না, এক কাজ দুবার করতে হতো না।

ডারউইনের কাজের কথায় ফিরে আসা যাক।

অসম্ভব পড়তেন ডারউইন। জীবজন্তু বা গাছপালা সম্বন্ধে যেখানে যা লেখা বার হতো, আনিয়ে নিয়ে পড়তেন। পড়া মানে কেবল পাতা উলটে যাওয়া নয়—দরকারি কথাগুলো পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে যেতেন, পাশে-পাশে নিজের মন্তব্য লিখে রাখতেন, বইয়ের শেষ পাতায় দাগ-দেওয়া পাতাগুলোর তালিকা (ক্যাটালগ) তৈরি করতেন, এবং দাগ-দেওয়া পাতাগুলো দেখে-দেখে গোটা বইটার একটা সারাংশ লিখে ফেলতেন।

এতো খেটেখুটে লেখা এই সারাংশগুলো ডারউইন যক্ষের ধনের মতো আগলে রাখতেন। একবার গ্রামে আগুন লাগার ভয় দেখা দিলো।

ডারউইন তখন তাঁর মেজো ছেলে ফ্রানসিসকে ডেকে মিনতি করে বলেছিলেন, আমার লেখার প্যাটরাগুলোকে কিন্তু তোরা বাঁচাস, ওগুলো যদি আগুনের গর্ভে যায়, সারা জীবনটা আমাকে কপাল চাপড়ে মরতে হবে।

কিন্তু ডারউইন শুধু পুঁথিপড়া পণ্ডিত ছিলেন না। বই-পড়া তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার, তথ্য সংগ্রহের মাত্র একটা দিক।

আর কী-কী দিক ছিলো?

নিজের চোখে দেখা।

ভালো জাতের নোতুন জাতের ফল ফলিয়েছে বলে যে-সব মালীদের নামডাক হতো, ডারউইন সোজা তাদের বাগানে চলে যেতেন।

যাদের চেষ্টা আর পরীক্ষার ফলে ভালো জাতের নোতুন জাতের জন্তু—ভেড়া বা গোরু বা শুয়োর জন্মেছে, ডারউইন সোজা তাদের গোয়ালে বা খোঁয়াড়ে চলে যেতেন।

সেখানে গিয়ে নিজের চোখে দেখতেন, মালী আর রাখালদের সঙ্গে আলাপ করে, প্রশ্ন করে বুঝে নিতে চাইতেন কেমন করে এই ব্যাপার-গুলো হলো।

কিন্তু সবাইয়ের কাছে তো আর সশরীরে যাওয়া যায় না, সব-কিছু স্বচক্ষে দেখাও যায় না। তাই তিনি মাঝে-মাঝে প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে নিয়ে নানান জনের কাছে চিঠির সঙ্গে পাঠিয়ে দিতেন—তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে প্রশ্নগুলোর জবাব লিখে পাঠিয়ে তাঁকে সাহায্য করেন।

ডারউইনের দু-একটা অদ্ভুত খেয়ালের কথা বলতে ইচ্ছে করছে।

কাগজ কী আর এমন দুর্মূল্য জিনিস। অথচ কাগজের উপর ডার-উইনের ভীষণ মমতা ছিলো—কাগজ নষ্ট করা তিনি একেবারে সহ্য করতে

পারতেন না। সাদা কাগজ, একপিঠে লেখা বা ছাপা কাগজ তিনি যত্নে রেখে দিতেন। সেই-সব কাগজে তিনি লেখার খসড়া করতেন। শোনা যায়, বিদ্যাসাগর মশাইয়েরও এই রকম কাগজ-প্রীতি ছিলো।

এখন যে খবরটা দেবো, শুনে তাজ্জব হতে হবে।

মনে করা যাক, আমরা ডারউইনের সঙ্গে দেখা করতে গেছি। দরোয়ান আমাদের লাইব্রেরি-ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেলো। গিয়ে হয়তো দেখবো, ডারউইন সুন্দরভাবে ছাপানো-বাঁধানো একখানা বই কোলের উপর রেখে পড়পড় করে ছিঁড়ছেন। আমরা নিশ্চয়ই হতভম্ব হয়ে বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে থাকবো। ডারউইন আমাদের অপ্রস্তুত দেখে প্রথমে একটু হেসে উঠবেন। তারপর আস্তে আস্তে বলবেন, "বইখানা বড়ো কাজের বই, প্রায়ই দরকার হয়। কিন্তু বড্ড মোটা। মোটা বই আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না—নাড়াচাড়া করতে এতো অসুবিধে হয়! তাই ছিঁড়ে দুখানা করে নিচ্ছি।"

লাএল-এর 'ভূতত্ত্বের মূলনীতি' বইখানার নাম আগেই করেছি। খুব বড়ো বই। ডারউইনেরই পেড়াপিড়িতে লাএল বইখানার দ্বিতীয় সংস্করণ দু-খণ্ডে ছাপান।

গল্প ছেড়ে এখন কাজের কথায় আসি।

১৮৪৪ সালে ডারউইনের লেখা সর্বপ্রথম ছাপার অক্ষরে বেরোলো। বইখানা আগ্নেয় দ্বীপ নিয়ে।

১৮৪৫ সালে বেরোলো ডারউইনের ভ্রমণকাহিনীর দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথম সংস্করণ ফিত্‌জ্‌-রয়ের লেখার সঙ্গে একত্রে ছাপা হয়েছিলো। এই-বার আলাদাভাবে বেরোলো। প্রথম সন্তানের উপর মায়ের যেমন বিশেষ একটা টান থাকে, এই বইখানার উপর তেমন একটা মমতা তাঁর বরাবরই

ছিলো। বইখানার কাটতিও হয়েছিলো খুব—দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয়েছিলো দশ হাজার, একটাও পড়ে থাকে নি। ডারউইন বেঁচে থাকতেই জার্মান আর ফরাসী ভাষায় এ-বইয়ের অনুবাদ বেরিয়েছিলো, আর তার একাধিক সংস্করণ ছাপা হয়েছিলো।

১৮৪৬ সালে 'দক্ষিণ আমেরিকার ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ' ('জিওলজি-কাল অবজারভেশন অন সাউথ আমেরিকা') নামে বই বেরোলো।

১৮৪৬ সাল থেকে শুরু করে একটানা আট বছর ধরে ডারউইন সেরিপিড নামে এক সমুদ্রজীব নিয়ে পরীক্ষা করতে থাকেন। এ প্রাণীটি ডারউইনেরপ্রথম নজরে পড়ে বীগল-এ থাকার সময়, চিলির সমুদ্র-উপকূলে। এ-জাতের অন্য প্রাণীদের সঙ্গে চিলির প্রাণীটির এতো দিক দিয়ে অমিল যে নজরে না পড়ে পারে না। কয়েক বছর পরে পোর্তুগালের উপকূলে ঐ নোতুন সেরিপিডের আরেকটির খোঁজ মিললো। আট বছর অনুসন্ধান আর পরীক্ষার পর দুখানা বই বেরোলো ঐ সেরিপিড সম্পর্কে।

১৮৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ডারউইন বীগল-জাহাজে-লেখা খাতাগুলো পেড়ে গুছিয়ে বসলেন। পুরোনো লেখাগুলোর উপর চোখ বোলাতে-বোলাতে কয়েকটি সিদ্ধান্ত আস্তে-আস্তে তাঁর মনে দানা বাঁধতে লাগলো, নিজে বার-বার হাতেকলমে পরীক্ষা করে সিদ্ধান্তগুলোকে যাচাই করে নিতে লাগলেন।

১৮৫৬ সালে লাএল ডারউইনকে তাঁর সিদ্ধান্তগুলো তথ্যপ্রমাণ দিয়ে বিশদ করে লিখে ফেলতে বললেন। তাঁর কথামতো ডারউইন লেখা শুরু করে দিলেন। লেখা প্রায় অর্ধেকটা এগিয়েছে, এমন সময় একেবারে অন্য ধরনের এক সমস্যা উপস্থিত হলো।

আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস নামে একজন ইংরেজ প্রকৃতি-সন্ধানী দক্ষিণ-

পূর্ব এশিয়ার নিরক্ষীয় অঞ্চলে গাছপালা-জীবজন্তু নিয়ে অনুসন্ধান চালাচ্ছিলেন। ১৮৫৮ সালের গ্রীষ্মকালে ডারউইন ওয়ালেসের কাছ থেকে একটা প্রবন্ধ পেলেন—মালয় উপদ্বীপ থেকে লিখে পাঠিয়েছিলেন। সঙ্গে একটা চিঠি—ডারউইন যদি মনে করেন প্রবন্ধটার কোনো মূল্য আছে তবে যেন অনুগ্রহ করে সেটা লাএল-এর কাছে পাঠিয়ে দেন।

প্রবন্ধ পড়ে ডারউইন তো অবাক! তিনি যা ভাবছেন ওয়ালেসও যে তাই লিখেছেন।

ইংল্যান্ডে তখন একটা বৈজ্ঞানিক সমিতি ছিলো—লিনিয়ান সোসাইটি। সেখানে ওয়ালেসের প্রবন্ধটি পাঠানো হলো। লাএল আর হুকার নামে আর-একজন বন্ধুর অনুরোধে ডারউইনও তাঁর সিদ্ধান্তের একটা সারাংশ তৈরি করে লিনিয়ান সোসাইটিতে পাঠালেন। দুজনের লেখাই সোসাইটির পত্রিকায় একই সঙ্গে প্রকাশিত হলো। ওয়ালেসের প্রবন্ধটির ভাষা ছিলো বেশ ঝরঝরে, সহজবোধ্য। কিন্তু ডারউইনের রচনাটি সেই হিসেবে বড়ো আড়ষ্ট হয়েছিলো। কিন্তু ডারউইন যে-আশা করছিলেন—তাঁদের লেখা পড়ে বৈজ্ঞানিক মহলে খুব একচোট শোরগোল উঠবে, তা কিন্তু উঠলো না। ডাবলিনের একজন অধ্যাপক মন্তব্য করেছিলেন, ওঁদের লেখার মধ্যে যেটা নোতুন সেটা মিথ্যে, আর যেটা সত্যি সেটা পুরোনো কথা।

এই ঘটনা থেকে ডারউইন একটা খুব ভালো শিক্ষা পেলেন। শিক্ষাটা এই : আনকোরা নোতুন কথা যখন লোককে শোনানো দরকার, তখন কথাটাকে ফলাও করে সবিস্তারে বুঝিয়ে বলতে হবে। নইলে লোকে সে-কথা কানে তুলবে না, তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

যাই হোক, ডারউইন হতাশ হলেন না, মাঝপথে-ছেড়ে-দেওয়া কাজ

আবার শুরু করলেন। ১৩ মাস ১০ দিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর লেখা শেষ হলো।

২৩ বছর পরে বই বেরোলো। বেরোলো বললে ভুল হবে—ডার-উইনকে দিয়ে বার করানো হলো। কেননা, ২৩ বছর পরেও তিনি মনে করছিলেন, এখনো সময় হয় নি, এতো তাড়াহুড়ো করে বই ছাপানো উচিত নয়। কিন্তু বন্ধুবান্ধবরা জিদ ধরলেন, আর কিছুতেই দেরি করা চলবে না, আর দেরি করলে এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের গৌরব থেকে ডারউইন বঞ্চিত হবেন।

বন্ধুদের অনুরোধ ডারউইন ঠেলতে পারলেন না। ১৮৫৯ সালের নভেম্বরে ডারউইনের 'অরিজিন অব স্পিসিস' বই প্রকাশিত হলো। প্রথম সংস্করণের ১২৫০ কপি—দীর্ঘ ২৩ বছরের কঠোর পরিশ্রমের ফল—যেদিন বেরোলো সেদিনই নিঃশেষে বিক্রি হয়ে গেলো। দ্বিতীয় সংস্করণের ৩০০০ কপিও দেখতে-দেখতে কেটে গেলো ; ১৮৫৯ থেকে ১৮৭৬—এই ১৭ বছরে এই রকম একখানা শক্ত বৈজ্ঞানিক বই মোট ১৬ হাজার কপি বিক্রি হলো।

মানুষের গোটা চিন্তার জগতে এই বই একটা তুমুল তোলপাড় সৃষ্টি করলো। পাদরিরা সাংঘাতিক খেপে উঠলো : ধর্মদ্রোহিতা। বাইবেল এমন কথা বলে না। ডারউইনকে মানলে বাইবেলকে অস্বীকার করতে হয়, ডারউইন সত্য হলে বাইবেল মিথ্যা হয়ে যায়।

(ডারউইন পাদরি হতে গিয়েছিলেন না।)

বাইবেল কী বলে ? বলে, 'কোনো-এক শুভদিনে' ঈশ্বর নানান জাতের প্রাণী সৃষ্টি করে পৃথিবীতে ছেড়ে দিলেন। অর্থাৎ আজ যা-যা

দেখছি তার প্রত্যেকটি—প্রত্যেকটি উদ্ভিদ, প্রত্যেকটি প্রাণী - সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই পৃথিবীতে আছে।

ডারউইন কী বললেন ? সবকিছু প্রথম দিন থেকেই নেই, ক্রমে হয়েছে, ধাপে-ধাপে এসেছে, বদলাতে-বদলাতে এগিয়েছে।

যাঁরা মানুষকে বড়ো করতে চান, পৃথিবীকে আরো সুখের জায়গা করতে চান, তাঁরা বাইবেলকে বাতিল করেছেন, তাঁরা ডারউইনকে গ্রহণ করেছেন।

ডারউইনের মতটা কী ? কী-কী তথ্যপ্রমাণ দিয়ে মতটিকে তিনি অকাট্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ?

সে-আলোচনা শুরু করার আগে ডারউইনের বৈজ্ঞানিক জীবনের আরো দু-চারটে কথা বলে নেওয়া ভালো।

'অরিজিন অব স্পিসিস'-ই ডারউইনের প্রধান বই। কিন্তু পরে ছোটো-বড়ো আরো কয়েকখানি বই ডারউইন লেখেন। ডারউইন-তত্ত্ব বোঝার পক্ষে সে বইগুলোও খুব দরকারি।

১৮৬৮ সালে বেরোলো ডারউইনের 'গৃহপালিত পশু ও উদ্ভিদের প্রকারভেদ' ('ভেরিয়েশন অব অ্যানিমল্‌স্ অ্যান্ড্ প্ল্যান্ট্‌স্ আন্ডার ডোমেস্‌টিকেশন')।

১৮৬২ সালে ডারউইন অর্কিড-গাছ নিয়ে লেখা একটা ছোটো বই ছাপেন। ১৮৭৫ সালে বেরোলো 'লতানে উদ্ভিদ' (ক্লাইম্বিং প্ল্যান্ট্‌স্)।

১৮৭১ সালে বেরোয় 'মানুষের আবির্ভাব' ('ডিসেন্‌ট্ অব ম্যান') ১৮৭১ সালে : 'মানুষ ও পশুদের মধ্যে আবেগের প্রকাশ' ('এক্সপ্রেশন অব দি ইমোশন্‌স্ ইন মেন অ্যান্ড অ্যানিমল্‌স্')। এই বইখানাও হু-হু করে বিক্রি হয়—প্রথম দিনেই ৫২৬৭ কপি। ১৮৭৫ সালে : 'কীট-ভোজী উদ্ভিদ' ('ইনসেক্‌টিভোরাস প্ল্যান্ট্‌স')। '১৮৭৭ সালে : 'বিভিন্ন

আকারের ফুল' ('ডিফারেন্‌ট্‌ ফর্মস অব ফ্লাওয়ার্স')। ১৮৭৯ সালে: তাঁর ঠাকুরদার জীবনী—'লাইফ অব ইরাজমাস ডারউইন'। ১৮৮০ সালে: 'উদ্ভিদের চলৎশক্তি' ('পাওয়ার অব মুভমেন্‌ট্‌ ইন্‌ প্ল্যান্‌ট্‌স')।

এইবার ডারউইন-তত্ত্বের আলোচনা শুরু করা যাক।

সাত

একটা পুকুর। মনে করা যাক, তাতে একটি মাছ ৫০০ ডিম পাড়লো। সব-কটা ডিম থেকে যদি পোনা-মাছ হয় তাহলে পুকুরে কটা মাছের পোনা পাওয়া উচিত? ৫০০টা। তা কি পাওয়া যায়? যে-কটা পোনা পাওয়া যায় তার সবগুলো কি বড়ো হয়? এর প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব—না।

বাগানে একটিমাত্র পেয়ারাগাছ। গুনে দেখলাম তিরিশটা পেয়ারা। ধরা যাক, প্রত্যেকটা পেয়ারায় গড়ে ১০০টা করে বীচি। মোট ৩০০০ বীচি। ৩০০০ বীচি থেকে ৩০০০ পেয়ারা গাছের চারা গজানো উচিত। দু-চার বছরে গোটা বাগানটা পেয়ারাগাছে ভরে যাওয়া উচিত। সত্যিই কি ভরে যায়? যতোগুলো চারা গজায় তার সব-কটা কি বড়ো হয়, ফল দেয়? প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব—না।

ডারউইনের দেওয়া একটা উদাহরণ ধরা যাক।

হাতি বাঁচে গড়ে একশো বছর। একশো বছরে একজোড়া হাতির গড়ে ছটা বাচ্চা হয়। মনে করা যাক, ৭৫০ বছর আগে একজোড়া হাতি ছিল, অনেক জোড়াই ছিলো, কিন্তু ধরে নেওয়া হলো একজোড়াই ছিলো। হিসেবমতো সেই হাতিজোড়ার ক'জন বংশধর জন্মানো উচিত ছিলো এই

৭৫০ বছরে? এক কোটি নব্বই লক্ষ জন। তা কি হয়েছে? স্পষ্ট জবাব—না।

ডারউইনের ভাষায় এই ঘটনাটার নাম হলো—অতিপ্রজনন।

অনেক ডিম হয়, অনেক বীজ হয়, অনেক বাচ্চা হয়। সব-কটা বাঁচে না, সব-কটা বড়ো হয় না। বেশির ভাগই মরে যায়, অল্পই বেঁচে থাকে, বড়ো হয়।

জীব জন্মাবার সঙ্গে-সঙ্গেই শুরু হয়ে যায় তার লড়াই। বেঁচে থাকার লড়াই। বাঁচতে হলে খাবার জোগাড় করে নিতে হবে, রোগের বিরুদ্ধে লড়তে হবে, চারিপাশের আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে, প্রবলতর শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে হবে।

ডারউইনের ভাষায় এই ঘটনাটার নাম হলো—বেঁচে থাকার লড়াই।

এই লড়াইয়ে যে জেতে সে টিকে থাকে, যে হারে সে মরে যায়।

কে জেতে? কে টিকে থাকতে পারে? যার লড়বার ক্ষমতা বেশি। একটা উদাহরণ:

এক বনে একপাল হরিণ থাকে। সেই বনে একটা বাঘ এলো। অনেক হরিণ বাঘের পেটে গেলো, কয়েকটা টিকে রইলো! কারা টিকে থাকতে পারলো? যাদের নজর অন্যদের চেয়ে ধারালো, যারা দৌড়তে পারে অন্যদের চেয়ে ভালো। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, একই জাতের হরিণ হলেও সব-কটা হরিণই হুবহু একই রকম নয়, কেউ-কেউ একটু অন্য রকম, সামান্য একটু তফাত। এই তফাতটুকুর জোরে কয়েকজন পার পেয়ে গেলো। আর এই সামান্য তফাতের অভাবে বাকিরা মারা পড়লো।

ডারউইনের ভাষায় এই ঘটনাটার নাম হলো—প্রকারণ বা প্রকারভেদ।

যারা পার পেয়ে গেলো, বেঁচে রইলো, তারা চেষ্টা করবে তাদের

বাচ্চাদের—বংশধরদের—সেই বিশেষ গুণটুকু দিয়ে যেতে। অর্থাৎ তাদের বাচ্চারা বাপঠাকুরদার মতো নজর ধারালো করতে চেষ্টা করবে, লম্বা-লম্বা পা ফেলে দৌড়তে চেষ্টা করবে। এক পুরুষে হয়তো সফল হবে না, কিন্তু কয়েক পুরুষ ধরে চেষ্টা করতে-করতে ক্রমশ সেই বিশেষ গুণগুলো ফুটে উঠবে।

বৃষ্টি নেই, মাটি যেন পাথর। গাছপালা সব শুকিয়ে যাচ্ছে, মরে যাচ্ছে। কিন্তু এক-আধটা ঐ অসহ্য গরমেও নেতিয়ে পড়ছে কিন্তু মরছে না। জল পেতেই আবার তাজা হয়ে উঠলো। ওই এক-আধটা গাছ বেঁচে গেলো কিসের জোরে? সোজা জবাব—তারা অন্যদের চেয়ে গরম সইতে পারে বেশি।

এই বৈশিষ্ট্য, এই স্বাতন্ত্র্য প্রত্যেকের মধ্যে, প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে, প্রত্যেক উদ্ভিদের মধ্যে, একই পরিবারের মধ্যে, একই মায়ের পেটের ভাই-বোনদের মধ্যে আছে। কেউ শীত সইতে পারে বেশি, কেউ গরম। কেউ খিদে সইতে পারে বেশি, কেউ কম। রোগে কেউ কাতর হয় বেশি, কেউ কম।

তাহলে জেতে কে? টিকে থাকে কে? যে অন্যদের চেয়ে একটু স্বতন্ত্র, একটু বিশিষ্ট।

টিকে যে থাকলো, সে তার শরীরের যে-অঙ্গগুলো তাকে টিকে থাকতে সাহায্য করলো সে-অঙ্গগুলোকে আরো নিখুঁত করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করে, যে-অভ্যাস যে-গুণ তাকে অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠতা দিলো সে-অভ্যাসের সে-গুণের ব্যবহার আরো বেশি করে করতে থাকে। আর যে-অঙ্গগুলো কাজে লাগলো না সেগুলোকে বর্জন করতে চেষ্টা করলো, যে-অভ্যাসগুলো বাধা হয়ে দাঁড়ালো সেগুলোকে বর্জন করতে চেষ্টা

করলো। এইভাবে ধীরে ধীরে বহুদিন ধরে তার উন্নত অঙ্গগুলো, সদভ্যাসগুলো তার বংশধরদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে ফুটে উঠতে থাকে, ক্রমে ক্রমে সেগুলো স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। সেই জাতির নোতুন এক প্রজাতি বা শাখা দেখা দেয়।

কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে ব্যাপারটা আরো তলিয়ে বুঝে দেখি।

গেরস্থ-বাড়ির খিড়কির পুকুরের হাঁস। সে হাঁস কি তেমন উড়তে পারে ? না। ডানা আছে, তবু ভালো উড়তে পারে না। বুনো হাঁস কিন্তু বেশ উড়তে পারে।

এমন হলো কেন ?

ডারউইন ওজন করলেন।

কীসের ওজন ?

তিনি পোষা আর বুনো হাঁসের ডানার হাড় ওজন করে দেখলেন, পোষা হাঁসের ডানার হাড় ওজনে হালকা। তেমনি আবার, পোষা হাঁসের পায়ের হাড় বুনো হাঁসের পায়ের হাড়ের চেয়ে ওজনে ভারি।

এমন হলো কেন ?

বুনো হাঁস ওড়ে বেশি, পোষা হাঁস পা চালায় বেশি।

মানুষ পোষ মানানোর আগে সব হাঁসই বনে থাকতো, উড়েফিরে খাবার জোগাড় করতো।

মানুষের পোষ মানার পর তাদের জীবনধারণ পালটে গেলো। পুকুরে সাঁতরে খাবার জোগাড় করতে শিখতে হলো। সব বুনো হাঁসই কি প্রথমে ভালো সাঁতার দিতে পারতো ? না, ওরই মধ্যে যাদের পায়ের জোর বেশি তারাই ভালো সাঁতরাতে পারলো, খাবার জোগাড় করে নিতে পারলো, বেঁচেবর্তে রইলো, বড়ো হলো, তাদেরই বাচ্চাকাচ্চা হলো।

আস্তে আস্তে পুরুষানুক্রমে এই সাঁতরাবার ক্ষমতাটা আরো বেশি হাঁসের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। ক্রমে বুনো হাঁস জাতিটা দুটি শাখায় আলাদা হয়ে গেলো—বুনো আর পোষমানা। পোষমানাদের শরীরের গড়নটাই অবস্থার ফেরে পালটে গেলো।

মাছেদের ব্যাপারটা ধরো।

যাদের শিরদাঁড়া আছে, তাদের বলে সমেরুক প্রাণী। পৃথিবীর প্রথম পুরোপুরি সমেরুক প্রাণী হলো মাছ।

কোটি কোটি বছর আগে পৃথিবীতে একবার মাছদের জলে বাস করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিলো—সে এক ভীষণ খরার দিন গেছে পৃথিবীতে। ডাঙায় না উঠলে বাঁচোয়া নেই। সব মাছই কি ডাঙায় উঠতে পেরেছিলো? পারে নি। চোখের সামনেই দেখি, কই মাছ দিবিা হেঁটে চলে যায়, ইলিশ মাছ ডাঙায় তোলা মাত্রই খাবি খেতে শুরু করে।

যাই হোক, কোনো কোনো জাতের মাছ ডাঙায় বাঁচতে শিখে ফেললো। আবার নদী-সমুদ্র ভরে উঠলো, কিন্তু তারা আর জলে ফিরলো না, ডাঙাতেই থেকে গেলো। যেমন, ব্যাঙের জাতটা। তাহলে দেখা গেলো, এক জাতের জলচর জীবই স্থলচর ব্যাঙ হয়ে গেলো। বাইরে থেকে দেখলে সেটা বোঝার জো নেই। কিন্তু গায়ের চামড়া খুলে দেখো—দেখবে অজস্র মিল দুটো শরীরে। মাছের পোনা আর ব্যাঙের ব্যাঙাচিকে পাশাপাশি রাখো—আগে থেকে না জানা থাকলে বলতে পারবে না কোন্‌টা মাছের বাচ্চা আর কোন্‌টা ব্যাঙের বাচ্চা। ব্যাঙ অবশ্য উভচর—ব্যাঙাচি-জীবনে থাকে জলে, লেজ খসিয়ে ব্যাঙ হলে স্থলে। এর থেকেই বোঝা যায়, ব্যাঙ প্রথমে জলেই থাকতো, জলচরদেরই এক শাখা অবস্থার ফেরে ক্রমশ উভচর ব্যাঙ হয়েছে।

জিরাফের উদাহরণ নিয়ে বিষয়টা দেখা যাক।

একদল জিরাফ আছে বনে। মনে রেখো, আজকালকার জিরাফদের যারা পূর্বপুরুষ তাদের গলা মোটেই এমন লম্বা ছিলো না। সে-বনে সব উঁচু-উঁচু গাছ। সকলের গলা সমান লম্বা নয়। যাদের গলা একটু বেশি লম্বা তারাই উঁচু ডালের নাগাল পায়। তারাই ফলপাতা খেয়ে বেঁচে থাকে, বংশবৃদ্ধি করে। ছোটো-গলারা বাঁচতে পারে না, বংশবৃদ্ধি করতে পারে না। লম্বা-গলাদের বংশ বাড়ে, বংশ-পরম্পরায় গোটা জিরাফ জাতিটাই লম্বা-গলা হয়ে যায়।

প্রকৃতিতে এই যে ব্যাপারগুলো ঘটছে—সমস্ত জীবের বংশবৃদ্ধির চেষ্টা, তাদের মধ্যে টিকে থাকার লড়াই, বিশেষ গুণের জোরে কারো কারো সেই লড়াইয়ে জিততে পারা, ভাবী বংশধরদের মধ্যে সেই বিশেষ গুণটি চারিয়ে দেবার চেষ্টা—ডারউইন এই সমস্ত ঘটনাধারার নাম দিয়েছেন

প্রাকৃতিক নির্বাচন

সোজা ভাষায় নির্বাচন মানে কী ? বাছাই। পাঁচটার মধ্যে যেটা ভালো সেটাকে বাছাই করে দিলাম। প্রকৃতির মধ্যেও যেন সেইভাবে বাছাই-করা চলছে—এইটা যোগ্য, এর লড়বার ক্ষমতাটা বেশি, এ টিকে থাকবে, এর বংশ টিকে থাকবে।

এই হলো ডারউইনের সিদ্ধান্ত। নানান উদাহরণ নিয়ে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এ সিদ্ধান্ত বোঝবার চেষ্টা করেছি। এবার একবার সংক্ষেপে একটানা ব'লে যেতে চেষ্টা করা যাক :

প্রকৃতির মধ্যে দেখি জীব ক্রমাগত তার সন্তানের জন্ম দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যে পরিমাণে জন্মায় সে পরিমাণে বাঁচে না,

অধিকাংশই পরিণত অবস্থায় পৌঁছবার আগেই ফৌত হয়ে যায়।

বাঁচবার জন্যে তাদের মধ্যে চলে ভীষণ লড়াই : খাবার পাবার জন্যে লড়াই, আবহাওয়ার সঙ্গে লড়াই, আত্মরক্ষার লড়াই।

এই লড়াইয়ে সেই জেতে যার অন্যদের চেয়ে কিছুটা বৈশিষ্ট্য আছে। সে বৈশিষ্ট্য যতো সামান্যই হোক না কেন, তা যদি তাকে লড়াইয়ে জিততে সাহায্য করে তবে তারই জোরে সে টিকে থাকবে, বংশবৃদ্ধি করবে, এই বৈশিষ্ট্যটুকু তার বংশধরদের মধ্যে চারিয়ে দিয়ে যাবে।

বংশপরম্পরায় এই বৈশিষ্ট্য আরো স্পষ্ট হয়ে সেই বংশের অনেকের মধ্যে ফুটে উঠতে থাকে। আর শেষ পর্যন্ত সেই বংশ এক নোতুন ধারা পায়, নোতুন একটা শাখা বা প্রজাতির সৃষ্টি হয়।

ডারউইন-তত্ত্বের মধ্যে নোতুন কথাটা কী? পরিবর্তন। এবং এই পরিবর্তনের একটা ব্যাখ্যাও তিনি দিলেন—প্রাকৃতিক নির্বাচন। ধর্মতত্ত্ব পরিবর্তন স্বীকার করে না—ভগবান একদিনে সবকিছু তৈরি করে দিয়েছেন। ডারউইন সেইখানে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করলেন—অকাট্য তথ্য-প্রমাণ দিয়ে : জীববিজ্ঞানের জগতে নোতুন যুগ নিয়ে এলেন তিনি, নোতুন নোতুন অনুসন্ধানের পথ খুলে দিলেন, নোতুন নোতুন তথ্য সংগ্রহের প্রেরণা সৃষ্টি করলেন পৃথিবীর অসংখ্য বিজ্ঞানীর মনে।

আট

ডারউইনের প্রমাণগুলো কী ?

১) ইতিহাসের প্রমাণ

জীবজগতের প্রত্যেক জাতির বা উপজাতির একটা ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস তো খাতার পাতে লেখা নেই, লেখা আছে পৃথিবীর বুকে, মাটির বিভিন্ন স্তরে, ফসিলের সাক্ষ্যে।

২) দেহগঠনের তুলনা থেকে প্রমাণ

বিভিন্ন জাতির জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মিলিয়ে দেখলে যে-সব প্রমাণ মেলে।

৩) ভ্রূণগঠনের তুলনা থেকে প্রমাণ

মায়ের পেটে থাকতে জীবের ক্রমে ক্রমে যে পরিবর্তনগুলো আসে তার থেকে সেই জীবের আগেকার ইতিহাস বোঝা যায়, অন্য জীবের সঙ্গে তার সম্পর্কটাও ধরা পড়ে।

প্রথম প্রমাণটা খতিয়ে দেখা যাক।

পৃথিবীর জমিটা পরখ করে দেখা গেছে, জায়গার জায়গায় স্পষ্ট-ভাবে যেন থাক-থাক করে সাজানো। নদী প্রত্যেক বছর নিচু জমিতে বা সমুদ্রের বুকে পলিমাটির একটা করে স্তর বিছিয়ে দিয়ে যায়। ক্রমে ক্রমে

উপরকার স্তরগুলো পরপর জড়ো হয়ে যখন ভারি হয়ে ওঠে, তখন নিচেকার স্তরগুলোর উপর খুব চাপ পড়ে। সেই চাপে নিচের স্তরগুলো শক্ত পাথর হয়ে যায়। স্তরগুলো যখন নরম থাকে তখন তার উপর নানা জীবজন্তু আর গাছপালার ছাপ পড়ে যায়। এই ছাপ-পড়ে-যাওয়া জীব-জন্তুর বা গাছপালার পাথুরে চেহারাকে বলে ফসিল। মাটি খুঁড়ে অনেক ফসিল বার করেছেন বৈজ্ঞানিকেরা।

এই ফসিলগুলো বলে দেয় পৃথিবীতে কোন্ সময় কোন্ কোন্ জাতের জীব বাস করতো।

পাথুরে প্রমাণের সাহায্যে ডারউইনের সিদ্ধান্তগুলো বুঝতে হলে ভূতত্ত্বের কয়েকটা কথা বুঝে নেওয়া বিশেষ দরকার।

বহু কোটি বছর আগে আমাদের এই পৃথিবীর জন্ম। পৃথিবীর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তার বুকে প্রাণী বা উদ্ভিদ দেখা দেয় নি, মাঝখানে বহু দিন কেটে গেছে।

প্রথম যখন পৃথিবীতে প্রাণী দেখা দিলো সেই থেকে মানুষের আবির্ভাব পর্যন্ত কোটি কোটি বছরের যে বিরাট সময়টা, ভূতত্ত্ববিদরা এই সময়টাকে পাঁচটি মহাযুগে ভাগ করেছেন—যেন একটা মোটা বইয়ের পাঁচটা খণ্ড। একটু মন দিয়ে দেখলেই মহাযুগগুলোর নাম মনে থেকে যাবে। নামগুলো বলে যাচ্ছি—পাতার নিচে থেকে পড়ে-পড়ে উপরে উঠতে হবে।

সেনোজোইক মহাযুগ

৪ মেসোজোইক মহাযুগ

৩ প্যালিওজোইক মহাযুগ

২ প্রোটেরোজোইক মহাযুগ

১ আর্কিওজোইক মহাযুগ

আর্কিওজোইক আর প্রোটেরোজোইক—এই প্রথম দুই মহাযুগের ভূস্তর থেকে বেশি ফসিল পাওয়া যায়নি। কেন? এই দুই মহাযুগে ঘন-ঘন ভূমিকম্পে আর অগ্ন্যুৎপাতে পৃথিবীর এমন ওলটপালট হয়েছে যে ফসিল সব নষ্ট হয়ে গেছে। তবু যে-সব ফসিল পাওয়া গেছে সেগুলো সবই সহজ সরল সমুদ্রজীবের: এক-সেল-ওয়ালা অ্যামিবা-জাতীয় প্রাণী, ছোটো ছোটো সামুদ্রিক কীটপতঙ্গ, আর শ্যাওলা-জাতীয় উদ্ভিদ—গুঁড়ি নেই, পাতা নেই, শুধু একদলা সবুজ। এই দুই মহাযুগে কোনো স্থলপ্রাণী বা স্থল-উদ্ভিদের ফসিল পাওয়া যায় না। তার থেকে এমন হিসেব করা ভুল হবে না যে ডাঙায় তখনও প্রাণের কোলাহল জাগে নি।

এই প্রথম দুই মহাযুগে জীবের সংখ্যাও কম, বৈচিত্র্যও কম—একটি বা অল্প কয়েকটি সেল দিয়ে গড়া অতি সরল গড়নের দেহ।

তৃতীয় মহাযুগের নাম প্যালিওজোইক। এই মহাযুগটিকে ছটি যুগে ভাগ করা হয়েছে—বইয়ে একটি খণ্ডের যেমন কয়েকটি পরিচ্ছেদ থাকে। সেই ছটি যুগের নাম—ক্যামব্রিয়ান, অর্ডোভিসিয়ান, সিলুরিয়ান, ডেভোনিয়ান, কার্বনিফেরাস, ট্রিয়াসিক। ক্যামব্রিয়ান যুগের ভূস্তর থেকে বৈজ্ঞানিকেরা অসংখ্য আর বিচিত্র জলচর জীবদেহের ফসিল উদ্ধার করেছেন—একটি বাদে। সেই না-পাওয়া ফসিল-প্রমাণটি হলো শিরদাঁড়াওয়ালা প্রাণীর।

তারপরে এক যুগের পর এক যুগ এগোতে জীবের সংখ্যা বাড়তে লাগলো, একটু জটিল গড়নের জীব দেখা দিতে লাগলো, শিরদাঁড়াওয়ালা প্রাণী দেখা দিলো—মাছ; আস্তে আস্তে নানান জাতির উদ্ভিদে ডাঙা ভরে উঠলো—গোটা কার্বনিফেরাস যুগটার স্থল-উদ্ভিদের আধিপত্য। সমস্ত

পৃথিবী ঘন বনে বনময়। কিন্তু সে-বনে তখন ফুলের বাহার দেখবে না। ফুলওয়ালা উদ্ভিদের আসতে তখনও দেরি আছে। সেই-সব উদ্ভিদই পরে মাটিচাপা পড়ে কয়লা হয়ে গেছে। কার্বনিফেরাসের যুগকে তাই সহজ করে আমরা কয়লা-যুগ বলতে পারি।

মাছ আগেই সিলুরিয়ান যুগে দেখা দিয়েছে—এই মহাযুগেরশেষ যুগের (ট্রিয়াসিক যুগের) গোড়াতেই দেখা দিলো প্রথম স্থলচর প্রাণী—ব্যাঙ। ব্যাঙ অবশ্য পুরোপুরি স্থলচর নয়—উভচর। পুরোপুরি স্থলচর জীবও এই যুগেই দেখা দিলো—সরীসৃপ, আদিম সরীসৃপ : টিকটিকি, গিরগিটি ইত্যাদি প্রাণী।

চতুর্থ মহাযুগকে (যার ভূতাত্ত্বিক নাম মেসোজোইক মহাযুগ) বলা যেতে পারে সরীসৃপদের যুগ। এই যুগের সরীসৃপেরা আর টিকটিকি-গিরগিটির মতো ছোটোখাটো নিরীহ প্রাণী নয়। যেমন দাঁতভাঙা নাম তাদের, তেমনি দৈত্যের মতো বিকট চেহারা—ডাইনোসর, ডিপ্লোডকাস, ব্রোন্টসরাস। গোটা মেসোজোইক মহাযুগ ধরে এই-সব বিকটাকার অতিকায়রা পৃথিবীতে একাধিপত্য করেছে। কোনোটা লম্বায় ১০০ ফুট, কোনোটার ওজন প্রায় হাজার মণ।

এই সরীসৃপদেরই একটি শাখা সামনের পা দুটোকে আকাশে মেলবার চেষ্টা করতে করতে পাখি হয়ে যায়। সবচেয়ে প্রাচীন যে-পাখির ফসিলের সন্ধান পাওয়া গেছে তার নাম আরকিওপটেরিক্স। যেমন তার বিদঘুটে নাম, তেমনি তার কিম্ভূত চেহারা—সরীসৃপের মতো লেজ, সরীসৃপের মতো দাঁত, কিন্তু আবার পাখির মতো ছুঁচলো ঠোঁট, পাখির মতো পালকওয়ালা একজোড়া ডানা।

এই মহাযুগের প্রথম দিকে স্তন্যপায়ীরা দেখা দিয়েছে। স্তন্যপায়ী

কাদের বলে ? প্রথমত, তাদের গায়ে লোম বা চুল থাকে। দ্বিতীয়ত, তারা ডিম পাড়ে না, তাদের পেটে বাচ্চা হয়। বাচ্চা মায়ের বুকের দুধ খেয়ে বেঁচে থাকে, বড়ো হয়।

ফুলওয়ালা উদ্ভিদও এই মহাযুগে দেখা দেয়, তার আগে উদ্ভিদের ফুল হতো না।

চতুর্থ মহাযুগ যখন শেষ হবার মুখে, তখন অতিকায় সরীসৃপদের একাধিপত্যের দিনও ঘনিয়ে এসেছে। কেন ? কারণ যে গরম, জোলো আবহাওয়ায় ডাইনোসরদের এতো বাড় বেড়েছিলো সেই আবহাওয়া বদলে গেলো, বরফের যুগ এলো।

সবশেষের যে মহাযুগ—সেনোজোইক মহাযুগ—তাকে বলতে পারি স্তন্যপায়ীদের মহাযুগ। এই মহাযুগকে পাঁচটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। এই পাঁচটি অংশের নাম মনে করা রাখা ভালো :

ইয়োসিন (Eocene)

অলিগোসিন (Oligocene)

মিয়োসিন (Miocene).

প্লায়োসিন (Pliocene)

প্লায়োস্টোসিন (Pleistocene)

সেনোজোইক মহাযুগের শুরু থেকেই পৃথিবীতে স্তন্যপায়ীদের প্রতাপ বাড়তে আরম্ভ করেছে। নানান জাতির স্তন্যপায়ী জীব পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে, বংশ বিস্তার করেছে। তাদের এই দ্রুত বিস্তারের প্রধান কারণ তিনটি : প্রথমত, এদের গায়ের রক্ত গরম। দ্বিতীয়ত, তাদের গায়ে ঘন লোম থাকার ফলে তারা কনকনে ঠাণ্ডায় কাবু হয় না। তৃতীয়ত, তারা ডিম পাড়ে না, বাচ্চা পাড়ে। ডিম যতো নষ্ট হয়, পরিণত শিশু কিছুতেই

ততো বেশি নষ্ট হতে পারে না। তার পরিণত শরীর নিয়ে সে পৃথিবীর সঙ্গে যুঝতে পারে বেশি।

এই মহাযুগের গোড়ার দিকেই দেখা দেয় সেকালের সবচেয়ে বুদ্ধিমান জীব—বাঁদর। বাঁদর থেকেই মাত্র তিন-চার লক্ষ বছর আগে, প্লায়োস্টোসিন যুগে মানুষের আবির্ভাব।
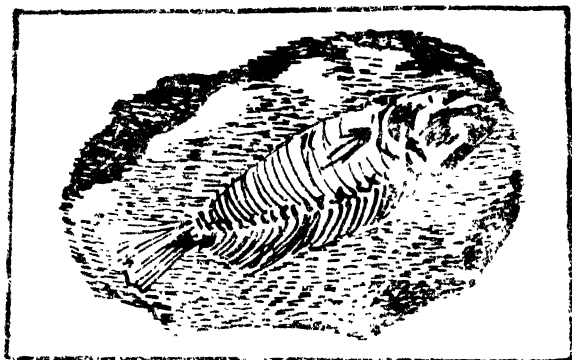
একটি মাছের ফসিলের ছবি

পৃথিবীর সব-নিচের স্তর থেকে সব-উপর স্তরের ফাঁসলগুলো যদি ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে রাখা যায় তাহলে পৃথিবীতে জীবের ক্রমবিকাশের একটা পরিষ্কার ছবি ফুটে ওঠে। সেই ছবিটা এই রকম :

প্রথম দুই মহাযুগ : আদিম প্রাণ

সহজ সরল ধরনের জীব। প্রথমে যারা জন্ম নিলো, একটি মাত্র সেলের শরীর তাদের। তাদের পরে যারা এলো, মাত্র কয়েকটি সেল দিয়ে তৈরি তাদের দেহ। তারা বাস করে সমুদ্রের জলে। থলথলে শরীর, গায়ে হাড় নেই। তাই তাদের ফাঁসল বড়ো একটা পাওয়া যায় নি।
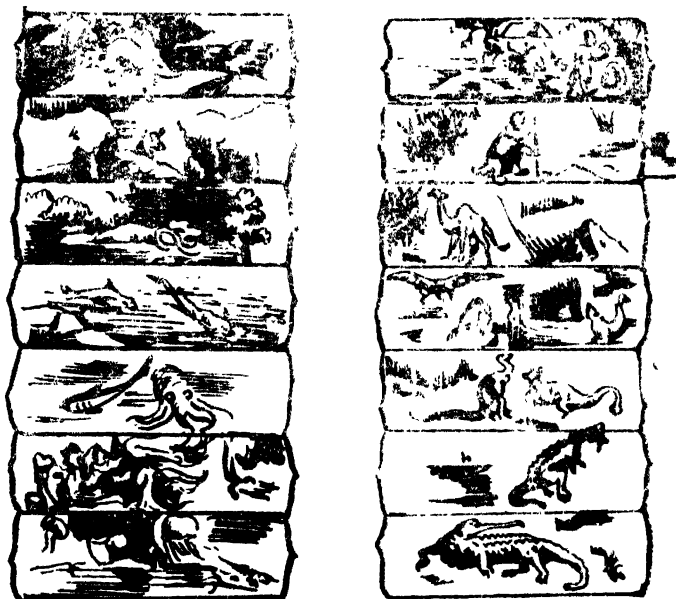
চোদ্দ অধ্যায়ে প্রাণের ক্রমবিকাশের কাহিনী। ক্রমবিকাশের চূড়ায় মানুষ
(ছবি দেখতে হবে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে, এবং নিচে থেকে উপরে)

উদ্ভিদের রাজ্যেও সরল দিয়ে শুরু : শ্যাওলা, ছাতা—এইসব জাতের উদ্ভিদ। তাদের ফুল হয় না, বীজ হয় না।

তৃতীয় মহাযুগ : বৈচিত্র্য আর প্রাচুর্য

প্রাণিজগতে—সমেরুকঅর্থাৎ শিরদাঁড়াওয়ালা প্রাণী ছাড়া অন্য সব জাতির প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছে। সমুদ্রজলে ট্রাইলোবাইট নামে একজাতীয় জল-জন্তুর খুব দাপট। প্রথম সমেরুক প্রাণীর আবির্ভাব। দেখতে তাদের ডাক্তারবাবুদের ছুরির মতো। তখনও তাদের পুরোপুরি শিরদাঁড়া গজায় নি, যেখানে শিরদাঁড়া থাকবার কথা, সেখানে রবারের মতো নরম হাড়জাতীয় জিনিসের একছড়া মালা। মাছের সঙ্গে তাদের অনেক মিল। মাছের আবির্ভাব। তার থেকে ক্রমশ উভচর ব্যাঙ। তার থেকে সরীসৃপ।

উদ্ভিদজগতে—জল থেকে ডাঙায় ওঠবার চেষ্টা। শ্যাওলা আর ছাতাজাতীয় অপুষ্পক স্থল-উদ্ভিদ। প্রথম অপুষ্পক উদ্ভিদ,—তাদের ফুল ফোটে না, ফল ধরে না, বীজ পাতার উপর আঢাবা অবস্থায় জন্মে থাকে। ফারন্-জাতীয় গাছ—অপুষ্পক উদ্ভিদের প্রাচুর্য। কয়লার যুগ।

চতুর্থ মহাযুগ : ডাইনোসরদের প্রতাপ

প্রাণিজগতে—সরীসৃপদের বংশবিস্তার। ডাইনোসরদের প্রবল প্রতাপ। সরীসৃপদের এক শাখা আকাশে উড়লো—পাখির পূর্বপুরুষ। স্তন্যপায়ীরা আসছে, গায়ে তাদের ঘন লোম, তারা ডিম পাড়ে না, তাদের বাচ্চা হয়। ডাইনোসররা হটে গেলো—স্তন্যপায়ীরা সংখ্যায় বাড়ছে।

উদ্ভিদজগতে—সপুষ্পক উদ্ভিদ দেখা দিয়েছে, তাদের ফুল ফোটে, বীজ ঢাকা থাকে, ফুল থেকে ফল ধরে। তাদেরই প্রাচুর্য আর প্রাধান্য দেখা যাচ্ছে।

পঞ্চম মহাযুগ : মগজ যার দুনিয়া তার

স্তন্যপায়ীরা সংখ্যায় বাড়ছে, অনেক জাতের স্তন্যপায়ী দেখা দিচ্ছে, সবচেয়ে বুদ্ধিমান স্তন্যপায়ী বাঁদর দেখা দিয়েছে। সেই বাঁদরদেরই সবচেয়ে বুদ্ধিমান এক শাখা থেকে আধুনিক প্লায়োস্টোসিন যুগে জন্ম নিলো মানুষ।

ডারউইন বলেছিলেন, "খুব সামান্য এক আরম্ভ থেকে সবচেয়ে সুন্দর সবচেয়ে আশ্চর্য অসংখ্য রূপ ক্রমাগত বিকশিত হয়েছে।" পাথরের এই ছবিকে অনুসরণ করে ক্রমবিকাশের যে-ধারাটি পাই তার থেকে বুঝি ডারউইনের প্রত্যেকটি কথা বর্ণে বর্ণে সত্য।

ডারউইন তাঁর 'ডিসেন্ট অব ম্যান' বইতে প্রমাণ করে গেছেন, কিভাবে বনমানুষদেরই এক শাখা অবস্থার ফেরে বদলাতে-বদলাতে মানুষ হয়েছে। কিন্তু শুধু মানুষ কেন। আজ আমরা গণ্ডার, হাতি, উট আর ঘোড়ার যে অসংখ্য ফসিল পেয়েছি, সেগুলোকে নিচের থেকে উপরে পরপর সাজিয়ে রেখে পরিষ্কার বুঝতে পারি, খুব আগে তারা অন্য রকম ছিলো, তারপর একটু-একটু বদলাতে-বদলাতে তারা আজকের চেহারা পেয়েছে।

ঘোড়ার কথাই ধরা যাক। ঘোড়া জন্তুটা একেবারে গোড়ার থেকেই আজকের মতো একখুরওয়ালা, লম্বা-পা-লম্বা-গলাওয়ালা স্তন্যপায়ী ছিলো না। এমন খাঁজওয়ালা পোক্ত দাঁতও গোড়ার থেকেই ছিলো না। ঘোড়ার পূর্বপুরুষ দেখতে ছিলো খ্যাঁকশেয়ালের মতো, লম্বায় খুব বেশি হলে এক ফুট, সামনের পায়ে চারটে করে আর পিছনের পায়ে তিনটে করে খুর

ছিলো তাদের। আজকের ঘোড়ার পায়ের নিচের দিকটা একটা হাড় দিয়ে তৈরি, তার পূর্বপুরুষের সেখানে ছিলো দুখানা হাড়। এই ঘোড়াদের নাম ? ইওহিপ্পাস।

তারপর কী বদল হলো ?

চার পায়েই তিনটে করে খুর, কিন্তু মাঝের খুরগুলো আকারে বড়ো, শরীরের বোঝাটা তারাই বেশি বয় কিন্তু চলবার সময় বাকি খুরগুলোও মাটি ছোঁয়। দাঁতের খাঁজগুলো আগে স্পষ্ট ছিলো না, এখন বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। খাঁজ থাকার জন্যে ঘাস আর খড় চিবোতে সুবিধে খুব। এদের নাম মেসোহিপ্পাস।

তারপর ?

ছোটো খুরগুলো এতো ছোটো হয়ে গেছে যে মাটিও ছোঁয় না। পায়ের নিচের হাড় দুটো মিলে একটা হয়ে গেছে। আধুনিক ঘোড়ার সঙ্গে তার সব বিষয়েই মিল, তবে চেহারাটা ছোটো। এদের নাম প্রোটোহিপ্পাস। প্রোটোহিপ্পাস থেকে আধুনিক ঘোড়া হয়েছে।

এক নিশ্বাসে ঘোড়া হয়নি।

মানুষও এক নিশ্বাসে হয় নি। সমেরুক জীবদের সব-উঁচু ধাপে মানুষ। সব-নিচু ধাপে মাছ। মাছই অবস্থার ফেরে ব্যাঙ হলো। ব্যাঙেরই এক শাখা বদলাতে-বদলাতে সরীসৃপ। স্তন্যপায়ীরা সরীসৃপদেরই এক শাখা থেকে এসেছে। স্তন্যপায়ীদের এক জাতি—বনমানুষ—মানুষের পূর্বপুরুষ।

এই হলো পাথরের প্রমাণ।

দ্বিতীয় প্রমাণটা খতিয়ে দেখা যাক।

বিভিন্ন জাতের জীবজন্তুর শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যদি মিলিয়ে দেখা যায়

তা হলে বোঝা যায় কোন্ জাতের জীব কিভাবে বদলে-বদলে গেছে। ব্যাঙ, কচ্ছপ, পাখি, ঘোড়া, তিমি, বাদুড় আর মানুষ—বাইরের চেহারায় এদের কি কোনো মিল আছে? কোনো মিল নেই। কিন্তু ব্যাঙের আর কচ্ছপের পা, পাখির ডানা আর ঘোড়ার সামনের দুখানা পা, তিমির পাখনা, বাদুড়ের ডানা আর মানুষের হাতের যদি তুলনা করা যায়, তা হলে বেশ বোঝা যায় এগুলোর মধ্যে গড়নের কতো মিল।

ঠিক এইভাবে উপরের খোলসটা খুলে ফেলে যদি ব্যাঙ, বাঁদর আর মানুষের কঙ্কাল মিলিয়ে-মিলিয়ে দেখি. মিল দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতে হবে।

এই জাতের আরেকটা প্রমাণ হলো লুপ্তপ্রায় অঙ্গ।

স্তন্যপায়ীদের এক জাতি থেকে মানুষ হয়েছে। কিন্তু স্তন্যপায়ীদের লেজ আছে, মানুষের নেই। কোথায় গেলো লেজ? মানুষেরও লেজ ছিলো, খসে গেছে। প্রমাণ? প্রমাণ রয়ে গেছে মেরুদণ্ডের শেষে একটুকরো হাড়ে। বাঁদরের শরীরে মেরুদণ্ডের শেষে ঠিক ঐ জায়গায় একটুকরো হাড় আছে, সেইখান থেকে লেজটা বেরিয়েছে।

আরেকটা উদাহরণ—তিমিমাছের পা। তিমি চতুষ্পদ স্তন্যপায়ী। জলে থাকার তাগিদে তাকে সামনের দুটো পাকে পাখনা বানিয়ে নিতে হয়েছে। কিন্তু পেছনের পা দুটো? নেই। কোথায় গেলো? যেখানে পা-জোড়া থাকার কথা সেখানটা কাটলে দেখা যাবে দুটো ছোটো ছোটো হাড় রয়েছে। তাহলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, তিমিরও পা ছিলো। অবস্থার ফেরে খসে গেছে।

লুপ্তপ্রায় অঙ্গগুলো বলে দেয়, আজ যে অঙ্গগুলোর আভাসটুকু মাত্র আছে একদিন সেগুলো পরিণত অবস্থায় ছিলো, সেগুলো কাজে লাগতো।
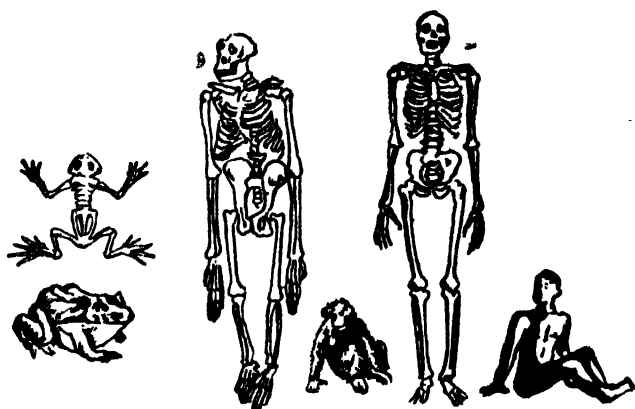
ব্যাঙ, গোরিলা আর মানুষ—কঙ্কালের চেহারায় কিন্তু খুব বেশি তফাত নয়। নিচের ছবিতে দেখো, চার রকম জানোয়ারের হাড়ের গড়ন অনেকটা একই রকম।
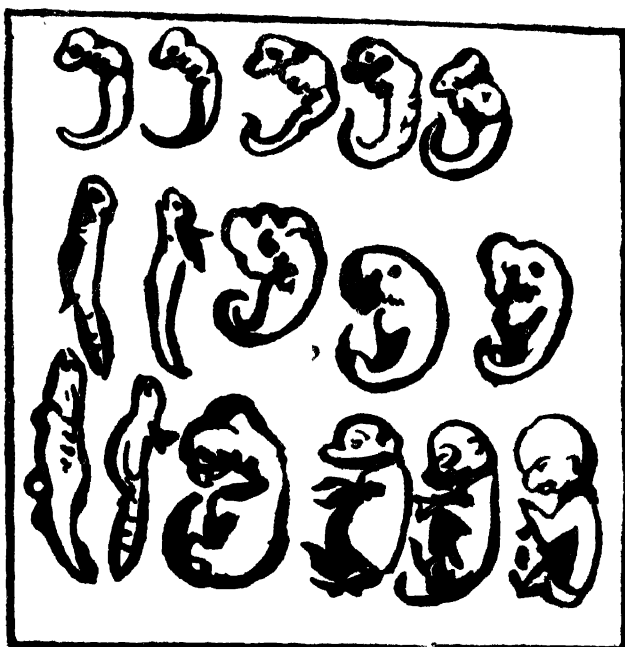
জন্মাবার আগে মাছ, মুরগি বা বাঁদরের বাচ্চার সঙ্গে মানুষের বাচ্চার খুব বেশি তফাত নেই। তাব থেকে কী প্রমাণ হয়?

আজ যাদের দেহে সে-অঙ্গগুলো লুপ্ত হয়ে গেছে তারা তাদেরই বংশধর—একবালে যাদের শরীরে সেগুলো টিকে ছিলো, লুপ্ত হয় নি।

এবারে তৃতীয় প্রমাণটা বুঝে দেখা যাক।

জন্তুরা যখন মায়ের পেটে থাকে—ভ্রূণ অবস্থায় থাকে—তখন চার জাতের ভ্রূণকে পাশাপাশি সাজিয়ে দিলে বলতে পারা কঠিন কোন্ ভ্রূণটা কোন্ জন্তুর—কোন্‌টা থেকে মাছ হবে, কোন্‌টা থেকে মুরগি, কোন্‌টা থেকে বাঁদর, আর কোন্‌টা থেকে মানুষ—প্রথম প্রথম তারা দেখতে এতো এক-রকম! মানুষের ভ্রূণ নিয়ে যাঁরা পরীক্ষা করেছেন তাঁরা দেখেছেন প্রথম দিকে তার হৃদয়-যন্ত্র মাছের মতো দুভাগে বিভক্ত। তারপর তার হৃদয়-যন্ত্র তিন ভাগে ভাগ হয়ে যায় ব্যাঙের মতো। সরীসৃপদেরও এই রকম হয়। মাছের কানের ভিতর যেমন গর্ত থাকে মানুষের ভ্রূণের ঘাড়ের দু পাশেও তেমন গর্ত দেখতে পাওয়া যায়। অন্য স্তন্যপায়ী জন্তুর ভ্রূণেও এইসব লক্ষ করা যায়।

এই ক পাতার মধ্যে ডারউইনের ক্রম-বিবর্তন তত্ত্বের খুব ছোটো করে একটা আলোচনা করা হলো। মোটের উপর কথাটা কী দাঁড়ালো?

পৃথিবীর বদল হয়, বদল হয়েছে, বদল হচ্ছে। পৃথিবীর জীবজন্তু গাছপালারও বদল হয়—অতীতে হয়েছে, আজও বদল হয়ে চলেছে, ভবিষ্যতেও হবে। কেননা, প্রাণের স্বভাবই হলো বদলানো।

আদিম কালে ছিলো সহজ-সরল কয়েক রকমের প্রাণী, সহজ-সরল কয়েক রকমের উদ্ভিদ। তারা বদলাতে-বদলাতে, জটিল হয়েছে; ক্রমে ক্রমে নোতুন নোতুন গুণ, পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে বহুতর বিচিত্রতর উন্নততর পশু আর উদ্ভিদ দেখা দিয়েছে পৃথিবীর বুকে—সেই উন্নতির সব উঁচু চূড়ায়—মানুষ।

নয়

ডারউইন বলে গেলেন—পরিবর্তনই প্রকৃতির নিয়ম।

তাঁকে যদি প্রশ্ন করতাম :

যুগের পর যুগ ধরে, একটু-একটু করে, প্রকৃতি জীবদেহে যে-পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসছে, যে গুণগুলো ফুটিয়ে তুলছে—মানুষ কি চেষ্টা করলে সেই পরিবর্তনগুলো আনতে পারে না? সেই গুণগুলো ফুটিয়ে তুলতে পারে না?

তিনি কী জবাব দিতেন? তিনি বলতেন জীবের শরীরে এই যে তফাতগুলো ঘটে, এই যে বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে ওঠে—যার জোরে সে বাঁচার লড়াইয়ে জয়ী হয়, যার থেকে জীবদেহের নোতুন রূপ গড়ে ওঠে—এগুলো দৈবাৎ হয়, এর কারণ জানা যায় না। এটা ডারউইনের-তত্ত্বের একটা দুর্বলতা।

তাই বলে যেন ডারউইনের চিরস্মরণীয় কীর্তিকে আমরা এতোটুকুও কম করে দেখবার চেষ্টা না করি। মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডারে তিনি যা দিয়ে গেছেন তাঁর মূল্য আমরা কখনো শুধতে পারবো না।

শুধু বিজ্ঞানের একটি শাখায় নয়, শুধুই জীববিজ্ঞান বা বায়োলজির রাজ্যে নয়—মানুষের গোটা চিন্তার জগতে ডারউইন একটা প্রচণ্ড

আলোড়ন সৃষ্টি করে গেলেন। দর্শনচিন্তায়, সামাজিক-অর্থনৈতিক চিন্তায় একটা তুমুল ঝড় তুললেন ডারউইন, সেই ঝড়ে পুরোনো ভুল ধ্যানধারণাগুলো ঝরা পাতার মতো উড়ে গেলো। মানুষ সত্যকে চেনবার রাস্তা দেখতে পেলো—বিজ্ঞানের সত্য, জীবনের সত্য। যে-সত্যকে চিনলে মানুষ আরো বড়ো হতে পারবে।

কিন্তু আমাদের প্রশ্নটা ?

প্রশ্নটার জবাব অবশেষে পাওয়া গেলো—কাগজে-কলমে নয়, হাতে-কলমে জবাব।

জবাবটা কী ? জবাবটি কি এমন যে শুনলে মানুষ বলতে বুকখানা গর্বে ফুলে ওঠে ?

হ্যাঁ, গর্ব হবে। যিনি জবাব দিলেন তিনি বললেন,

প্রকৃতি দেবে এই আশায় আমরা
প্রকৃতির মুখ চেয়ে বসে থাকতে পারি
না ; আমাদের প্রকৃতির হাত থেকে
ছিনিয়ে নিতে হবে

'প্রকৃতির হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে'। অর্থাৎ, প্রকৃতিতে যা নেই তাই নিয়ে আসতে হবে। কী করে ? কিসের জোরে ?

যদি বুঝে নিতে পারি প্রকারভেদের কারণটা কী, তফাতগুলো ঠিক কেন হয়,—যা ডারউইন বুঝিয়ে দিয়ে যেতে পারেন নি—তাহলেই আমরা ছিনিয়ে নিতে পারি, প্রকৃতিতে যেটা আস্তে আস্তে ঘটে, সেটাকে দু দশ বছরেই ঘটাতে পারি।

পরিবর্তনের কারণটা কী ?

পারিপার্শ্বিক অবস্থা। পরিবেশ। পরিবেশের সঙ্গে জীবদেহের

ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, পরিবেশের মতো করে সে নিজেকে গড়েপিটে নেয়। তা না করে তার উপায় আছে? পরিবেশ থেকেই তো সে তার বেঁচে থাকার, তার পুষ্টির মালমশলা সংগ্রহ করবে। পরিবেশ তাকে যে-যে মালমশলা যে-যে উপকরণ জোগায় সেই নিয়েই তো সে বাঁচবে।

একটা উদ্ভিদ। তার পরিবেশ বলতে কী বুঝব? জমির গঠন, জমির আর বাতাসের উত্তাপ, বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের উপস্থিতি, বায়ু-প্রবাহের গতি আর আলো—এই সমস্ত মিলিয়ে তার পরিবেশ।

একটা উদাহরণ নিয়ে কথাটা ভালো করে দেখা যাক।

ভারতবর্ষে তুলো হয়। কিন্তু সে-তুলোর আঁশ ছোটো। ছোটো আঁশের তুলোয় সরেস কাপড় হয় না। সরেস কাপড় তৈরি করবার জন্যে আমাদের বিদেশ থেকে বড়ো আঁশের তুলো আমদানি করতে হয়।

এখন, ভারতবর্ষের কোনো উদ্ভিদবিজ্ঞানী যদি বলেন, দেশের এই লজ্জাটা ঘোচাবো, ভারতবর্ষে বড়ো আঁশের তুলোর চাষ করবো, তাহলে? পাঁচশো বছর আগে হলে তাঁকে হয়তো পাগলা-গারদে পুরতো কিংবা ধর্ম-দ্রোহী বলে নজরবন্দী করে রাখতো।

আজ? সকলে ধন্যি ধন্যি করবে, দেশের সুসন্তান বলে শ্রদ্ধা জানাবে।

কী করে এটা সম্ভব হবে? বড়ো আঁশের তুলোর পক্ষে কেমন পরিবেশ দরকার সেটা আগে বুঝে নিতে হবে। সেই রকম পরিবেশ তৈরি করতে পারলেই ধীরে ধীরে কয়েক বছরের মধ্যে ভারতবর্ষেও বড়ো আঁশের তুলো জন্মাবে।

একটুও গাঁজাখুরি নেই এ কথায়। একজন মানুষ দীর্ঘ যাট বছর ধরে অবিশ্বাসীদের চোখে আঙুল দিয়ে প্রত্যেকটি কথা প্রমাণ করে দিয়ে

গেছেন, তাঁর শিষ্যরা আজ প্রতিদিন প্রমাণ করে যাচ্ছেন অসংখ্য দিগন্তজোড়া শস্যক্ষেত্রে, বিরাট বিরাট ফলের বাগানে।

তাঁরা শস্যহীন বরফের দেশে গরম দেশের ভালো জাতের গম ফলাচ্ছেন, যে দেশে কখনো চা হয় নি, হতে পারে বলে কেউ বিশ্বাস করে নি, সেই দেশে চায়ের বাগান তৈরি করছেন।

মানুষ আর প্রকৃতির মুখ চেয়ে বসে থাকবে না, মানুষ প্রকৃতির হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে।

ডারউইনের কথা বলার জন্যে যে-কটা পাতা বরাদ্দ ছিলো এইটা তার শেষ পাতা।

ডারউইনের কথা শেষ করার আগে, যাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে ডারউইন অমর হয়ে রইলেন, তাঁর নামটুকু শুধু জানাতে চাই—

তাঁর নাম মিচুরিন!

ঈভান ভ্লাদিমিরোভিচ মিচুরিন।

সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী

চার্লস ডারউইন। রবার্ট ওয়ারিং ডারউইনের দ্বিতীয় পুত্র।

জন্ম : ফেব্রুয়ারি ১২, ১৮০৯। জন্মস্থান : শ্রুসবেরি, ইংল্যান্ড।

১৮২৫ : ডাক্তারি পড়ার জন্যে এডিনবরো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ

১৮২৮ : পাদরি হবার জন্যে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ

ডিসেম্বর ১৮৩১—অক্টোবর ১৮৩৬ : বীগল জাহাজে পৃথিবীভ্রমণ

১৮৩৮—১৮৪১ : তিন বছর জিওলজিকাল সোসাইটির সম্পাদক

১৮৩৯ : বিবাহ।

ফিতজ-রয়ের সঙ্গে একত্রে 'জার্নাল অব রিসার্চেস' প্রকাশ

১৮৪৪ : আগ্নেয় দ্বীপ নিয়ে লেখা বই প্রকাশ

১৮৪৫ : জার্নাল অব রিসার্চেস' ২য় সংস্করণ স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ

১৮৪৮ : 'দক্ষিণ আমেরিকার ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ' প্রকাশ

১৮৫৪ : সেরিপিড নামক সমুদ্রজীব নিয়ে লেখা বই প্রকাশ

১৮৫৯ : 'অরিজিন অব স্পিসিস' প্রকাশ

১৮৬২ : 'ফার্টিলাইজেশন অব অর্কিডস' প্রকাশ

১৮৬৮ : 'ভেরিয়েশন অব অ্যানিমেলস অ্যান্ড প্ল্যানটস আনডার ডোমেস্টিকেশন' প্রকাশ

১৮৭১ : 'ডিসেন্ট অব ম্যান' প্রকাশ

১৮৭২ : 'এক্সপ্রেশন অব ইমোশনস ইন মেন অ্যান্ড অ্যানিমলস' প্রকাশ

১৮৭৫ : 'ইনসেক্টিভোরাস প্ল্যানটস' প্রকাশ

১৮৭৭ : 'ডিফারেন্ট ফরমস অব ফ্লাওয়ারস' প্রকাশ

১৮৭৯ : 'লাইফ অব ইরাজমাস ডারউইন' প্রকাশ

১৮৮০ : 'পাওয়ার অব মুভমেন্ট ইন প্ল্যানটস' প্রকাশ

ডারউইনের পাঁচটি ছেলে, দুটি মেয়ে হয়েছিলো। ছেলেদের মধ্যে স্যার জর্জ হাওয়ার্ড জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর স্যার ফ্রান্সিস উদ্ভিদবিজ্ঞানী হিসাবে বিখ্যাত হন।

মৃত্যু : এপ্রিল ১৯, ১৮৮২